পটে আঁকা ছবি

অমরেন্দ্র দাস

শিউলীকে—

পায়ে আধখানা শ্লিপার, ঘাড় ছেঁড়া আদ্দির পাঞ্জাবী, একমাথা পাগলের মত চুল, এক মুখ দাড়ী, কোটরগত চোখ। যে ধর্ম্মতলার ওপর দিয়ে ঠিক দুপুর বেলা ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছিল। তাকে অনেকেই চেনেন। নাম শুনেছেন, চাক্ষুস দেখেননি। সে হচ্ছে নামকরা আর্টিষ্ট সুখেন্দু বোস।

সুখেন্দু এমন ভাবে পথ দিয়ে চলছিল, যে কোন মুহূর্ত্তে অ্যাক-সিডেণ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তাই রাস্তার লোকেরা তার চলার ভঙ্গি দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। কটুক্তি করছিল। কিন্তু সুখেন্দুর তখন সে সব দিকে লক্ষ্য নেই। সে চলছিল আর ঘন ঘন চঞ্চল দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিল সামনের দোকানের বড় বড় ঘড়িগুলোর দিকে।

—ইস্ আর বুঝি ঠিক সময়ে পৌছান গেল না! দুটোর সময় অ্যাপয়েণ্টমেন। আর এখন দুটো বাজতে পাঁচ। মাত্র হাতে পাঁচ মিনিট সময়। এই পাঁচ মিনিটে হেঁটে ভবানীপুর! অসম্ভব! গাড়ী করে গেলেও পাঁচ মিনিটে পৌছান যাবে না।

গাড়ীর কথা মনে আসতে সুখেন্দু মনে মনে হাসল একবার। হেসে পকেটের মধ্যে হাতটী চালিয়ে দিল। একটি আনি। সেটা পকেট থেকে বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। এই একটি আনিই তার সম্বল। এই একটি আনি সম্বল করে সে দেখা করতে চলেছে ডাক্তার অনিমেশ মুখার্জীর সঙ্গে ভবানীপুরে। ডাক্তার অনিমেশ মুখার্জী তাকে কল করেছেন তাঁর মেয়ে সুচরিতার একখানা পোট্রেট এঁকে দেবার জন্য। নৃত্যশিল্পী সুচরিতার অপরূপ ভঙ্গিমার ছবি। পারিশ্রমিক দেবেন অনিমেশ মুখার্জী তাকে একশ টাকা।

লোভাতুর পারিশ্রমিক। সন্দেহ নেই। সপ্তাহ খানেক আগে অনিমেশ মুখার্জী নিজে সুখেন্দুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। নাম অবশ্য

সুখেন্দুর কিছুটা হয়েছে কিন্তু এমন করে বাড়ীতে এসে কাজের খোঁজ! তার জীবনে এই প্রথম। তাই অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল অনিমেশ মুখার্জীকে—আমার ঠিকানা আপনি পেলেন কেমন করে?

অনিমেশবাবু পুরুগালের হাসি নিয়ে বলেছিলেন—আপনারা নামজাদা লোক, আপনাদের ঠিকানা জানতে কি মশাই বেগ পেতে হয়? ঠিকানা দিয়েছে আমার মেয়ে সুচরিতা—সুচরিতা মুখার্জী। নাম শোনেন নি? এবারে অল বেঙ্গলে যে ডান্সে ফার্ষ্ট হয়েছে? সে কিন্তু আপনাকে চেনে!

নামটা অবশ্য শোনে নি। তবু বোকা বনে যাবার আশঙ্কায় সুখেন্দুকে মাথা নাড়তে হয়েছিল।

অনিমেশবাবু আর বেশীক্ষণ বসেন নি। ঠিকানাটা সুখেন্দুর নোট বুকে টুকে দিয়ে শনিবার যেতে বলে গাড়ীতে গিয়ে ষ্টার্ট দিয়েছিলেন।

আজ সেই শনিবার—বেলা দুটো।

অথচ সুখেন্দুর আজ সকাল থেকেই কেমন যেন সব বিশৃঙ্খল। কেমন যেন সব ওলোটপালট। তার জীবনে প্রথম এই একজনের বাড়ী গিয়ে সেখানে সময় অতিবাহিত করে একটি মেয়েকে সামনে সারাক্ষণ বসিয়ে রেখে ছবি আঁকা। আনন্দ লাগে বৈকী! কিন্তু আনন্দ লাগলেও আনন্দ করবার উপায় নেই।

আজ চারদিন তার বাড়ীতে সব অনাহারে। বাড়ীতে পিতৃদেবের চাকরীতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে এতদিন সে আর্ট স্কুলে পড়েছে, বাড়ীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থ উপার্জনের জন্যে যে গুরুভার ছাব্বিশ বছরের যুবকের ওপর আসা উচিত ছিল সেটা এতদিন পিতৃদেবই হাসিমুখে নির্ব্বাহ করেছেন। কিন্তু কয়েক মাস থেকে হঠাৎ পিতৃদেব রোগাক্রান্ত হতে,—সব ওলোট-পালট হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে পিতৃদেবকে অফিস ছাড়তে হয়েছে। আর তখন এদিকে চাপ এসে পড়েছে সুখেন্দুর ওপর।

পটে আঁকা ছবি

ইজেলের ওপর তুলির সাহায্যে রঙ দিয়ে যার দিন কাটছিল। লোকের কাছ থেকে ঠুনকো মান সম্মান পাওয়ার ওপর যার লিপ্সা ছিল। হঠাৎ সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। বৃহৎ সংসার। ভাইবোন অনেকগুলি, মা বাবা। বড় ভাই সুখেন্দু। সেই উপার্জ্জনক্ষম। অথচ তার একটি কপর্দ্দকও আয় করবার সামর্থ্য নেই। তাই হাতের সামনে একশ টাকার কাজটা পেয়েও সুখেন্দুর ইচ্ছা করছিল না সেখানে যায়। কদিন ধরে অনাহারে আর অনিদ্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সুখেন্দু আর পারছিল না। কদিন নয় প্রায় কয়েক মাস। কয়েক মাসই প্রায় তারা উপবাসী।

পিতা সুবোধবাবু রোগশয্যায় শুয়ে সুখেন্দুকে কটূক্তি করেছেন—আর্টিষ্ট হয়েছে আর্টিষ্ট। আর্ট করে পেট ভরবে। বললাম আমার অফিসে একটা এ্যাপ্লাই করে দে।

হায়রে অর্থ! সাধারণ মানুষ শুধু অর্থই বোঝে। অর্থ পেলেই খুসী। অর্থ ছাড়া দয়া, মায়া, মোহ, ভালবাসা কোন কিছুরই কেউ দাম দেয় না। সুখেন্দু অন্ধকারে নির্জীব হয়ে বসে শুধু ভাবে। তবে কি বড় হওয়ার সাধনা করা ভুল? অন্যায়? তার অন্তরই তার উত্তর দিয়েছে—হ্যাঁ ভুল, পেটে জ্বালা ধরলে বিশ্বভূমণ্ডল যখন অন্ধকারের মসিলেখায় লিপ্ত হয়ে যায় তখন এসব বাজে চিন্তা ভুল নয়—অন্যায়। তবু সুখেন্দু নিজেকে প্রফেসনাল আর্টিষ্টের মত তৈরী করে উঠতে পারে নি। কেবলই বার বার চিন্তা এসেছে মাথায়—এতখানি নীচে নেমে যাব! আর্টকে নিয়ে ব্যবসা করব?

কিন্তু সামনের ঘরে কারখানায় চাকরী করে মহিতোষ। তাকে দেখিয়ে যখন তার মা বলেছেন—ওর যা দাম আছে, তোর তাও নেই। ও জানিস্ মাস গেলে দুশ টাকা উপায় করে আর তুই…। তখন সুখেন্দুকে সব চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যবসা করবার মন তৈরী করতে হয়েছে। সত্যিই ত যার রঙ তুলি কেনবার পয়সারও সংস্থান নেই সে কি করে এখনও নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করছে?

কিন্তু ব্রততী শুনে কাঁদতে সুরু করে দিল। ঐ একটা মেয়ে। যে আর্টের কিছু বোঝে না। শুধু সুন্দরকে ভালবেসেই যে মরীয়া। সে বলল—না দাদা, তুমি যদি আর্টকে বিক্রী করতে শুরু কর, তাহলে তোমার অপমৃত্যু হবে।

সুখেন্দু হেসে উঠল বোনের কথায়। চিন্তা করল—ব্রততী আর্টকে ভালবেসে এ কথা বলে, না তার দাদাকে ভালবেসে এ কথা বলছে! কিন্তু সন্দেহ সম্পুর্ণরূপেই নিরসন। ব্রততী নিজের অন্তর দিয়েই সুন্দরকে ভালবাসে। তাই একদিন হাসতে হাসতে সুখেন্দু ব্রততীতে জিজ্ঞাসা করল—ব্রততী, তোকে যদি সুন্দরের পঙ্কে ডুবে মরতে বলি—পারবি?

ব্রততীও হাসতে হাসতে উত্তর দিল—হ্যাঁ, সুন্দরের পঙ্কে ডুবে মরবার আগে মনের যে অবস্থা হয় সে অবস্থা কি দাদা কখনও অন্য কিছুতে মনে হয়? মরণ ত মানুষের আছেই। রোগেও মরে, পুড়েও মরে।

ঐ একটী মেয়ে। এই গরীবের সংসারে জন্মগ্রহণ করেও অদ্ভুত মন পেয়েছে। সুখেন্দুর তাই এক এক সময় হাজার মনে কষ্ট হলেও শান্তি পায়—যখন ব্রততীকে সে কাছে এনে বসায়।

এক একদিন শান্তির জন্যে ব্রততী গীতার এক একটা শ্লোক মুখস্থ শুনিয়ে দাদাকে শান্ত করে—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

অদ্ভুত এই মেয়ে। সুখেন্দু তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে বোনের মুখের দিকে।

তবু একদিন কিন্তু তাকে আর্টের ব্যবসাই সুরু করে দিতে হয়। সারারাত্রি জেগে সে কয়েকটী সিন সিনারির ছবি একদিন এঁকে ফেলল। তারপর সেগুলো লুকিয়ে নিয়ে কলেজ স্কোয়ারের কাছে চলে এল।

পটে আঁকা ছবি

একটু একটু অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। কলকাতা নগরীর আলোকমালা জ্বলতে সবে সুরু করেছে। সুখেন্দু চারিদিকে একবার শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছবি ক'খানা এক একটা ক্লিপ দিয়ে রেলিঙে টাঙিয়ে দিল। ভাল ছবি। হাতেরও তুলনা করা যায় না। ছবি দেখলেই লোকের আকর্ষণ আসে। অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে গেল। আলাপ করল সুখেন্দুর সঙ্গে—তারপর একখানা আট আনা দিয়ে কিনে নিয়ে চলে গেল।

বাড়ী গিয়ে মার হাতে পয়সাগুলো গুঁজে দিতে মা কিছু বললেন না, বলল বোন ব্রততী—দাদা পয়সা কোথায় পেলে?

জিজ্ঞাসা করার ধরণেতেই সুখেন্দু বুঝতে পেরেছিল, বোন তার সন্দেহ করেছে। হেসে অবস্থাটা লঘু করবার চেষ্টা করে সুখেন্দু বলল—এই কিছু পেয়ে গেলাম।

—পেয়ে গেলে? উঁহু, পেলে কোথায় তাই বল না।

মা ধমক দিলেন—তোর বাপু অত জমাখরচের কি দরকার? এনেছে, সে যেখান থেকেই হোক্। উপার্জন করবে না? পুরুষ-মানুষ!

ধমক খেয়ে ব্রততী তখনকার মত চুপ করে গেল। কিন্তু মা চলে গেলে আড়ালে জিজ্ঞাসা করল—দাদা, বলবে না, কোথ্থেকে পেলে?

বোনের এমন ধরণের কাতরভাবে জিজ্ঞাসাতে সুখেন্দু আর চুপ করে থাকতে পারল না বা মিথ্যে কথা বলতে পারল না। বলল আদ্যোপান্ত সব। শুনে ব্রততী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তারপর উঠে চলে গেল।

ব্যাপারটা দেখে সুখেন্দু তাড়াতাড়ি গিয়ে হাতটা ধরে ফেলল ওর, বলল—একি? কিছু বলবি না? চলে যাচ্ছিস্ যে বড়?

—না এমনি। ব্রততী মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখল।

—না এমনি নয়। তোকে বলতেই হবে। সুখেন্দু গলায় জোর দিল।

ব্রততী তবু কিছু বলল না। বলল শেষকালে সুখেন্দুর পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে—কেন মিছে আমাকে আর জ্বালাতন করছ দাদা? তোমার যা খুসী তাই কর। নীচে যখন নামতে সুরু করেছ। নামো, যত পার নামো, কিছু বলব না। ভগবান চোখ দিয়েছেন শুধু দেখব আর কাঁদব। কাঁদতে ত কেউ নিষেধ করবে না। এই বলে ব্রততী ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

আর সুখেন্দু। কি আর বলবে সে। তার বলার অনেক কিছু থাকলেও আজ যে সব বলা না বলার মধ্যে। আস্তে আস্তে সে সে-স্থান থেকে সরে গেল।

মনে পড়ে—কোন এক একজিবিসনে কোন এক ভদ্রমহিলা তাকে উচ্চ প্রশংসা করে বলেছিলেন—বাবা, তোমার ছবি দেখে আমি সত্যিই বড় মুগ্ধ হয়েছি। দেখবে একদিন তুমি সারা দেশের গৌরব হবে।

সেদিন ভদ্রমহিলার কথাটা শুনে হঠাৎ মনটা—বোন ব্রততীর কাছে ছুটে চলে গিয়েছিল। আজ ভদ্রমহিলাও যে ভবিষ্যৎবাণী করলেন, ব্রততীও একদিন সেই ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিল—দেখবে দাদা, তুমি একদিন দেশের গৌরব হয়ে ওঠ কি-না? তখন কিন্তু এই ছোট বোনের কথা মনে কর—বুঝলে?

সুখেন্দু ব্রততীর অদূর ভবিষ্যতের কথা শুনে না হেসে পারে নি। বলেছিল—তুই কি ভেবেছিস্ ব্রত? আমায় তুই ভালবাসিস্ বলে কি সবাই আমায় ভালবাসবে?

ব্রততী ঠোঁট উল্টে বলেছিল—হুঁ, তোমাকে ভালবাসতে আমার বয়ে গেছে? তুমি ত একটা ছন্নছাড়া মানুষ, তোমাকে কেন ভালবাসতে যাব? তোমার আর্টকেই আমি ভালবাসি। তোমার সৃষ্টিকেই আমি শ্রদ্ধা করি। কথাগুলো শুনতে কেমন বেখাপ্পা লাগে। কিন্তু সুখেন্দুর ঐ ভাল লেগে ছিল।

পটে আঁকা ছবি

একদিন সন্ধ্যেবেলা আবার সুখেন্দু কতকগুলো ছবি এঁকে নিয়ে বিক্রী করতে যাচ্ছিল।

পর ত পর একেবারে ব্রততীর সামনে। সুখেন্দু তাড়াতাড়ি পালানর চেষ্টা করল। ব্রততী কোমরে তু'হাত দিয়ে চোখ তুটো বড় করে শাসনের সুরে বলল—দাদা, দেখি তোমার হাতে ওগুলো কি?

দিতে আর তর সইল না। ব্রততী হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিল। তারপর সস্তাধরণের কয়েকটা সিন-সিনারি আঁকা ছবি দেখে ওর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—এসব এঁকেছ কেন? কি করবে?

লুকিয়ে আর কোন প্রয়োজন নেই। বরং ঘুরিয়ে বলতে গেলে ব্রততী ধরে ফেলবে। ওর চেয়ে সত্যি কথা বলাই ভাল। তাই মিওনো গলায় বলল সুখেন্দু—এই কটা এঁকেছি বিক্রী করে পয়সা এনে দেব বলে।

—বিক্রী করে? ব্রততী ফেটে পড়ল।—উঃ দাদা, শেষ পর্য্যন্ত তোমার এই রকম অধঃগতি! সৃষ্টিকে যথাযোগ্য মূল্য না দিতে পেরে তুমি এমন করে অপমান করতে সুরু করে দিয়েছ?

—কি করব বল বোন? দেখছিস্ ত ঘরে একটা পয়সা নেই। আমি যদি না এনে দিই তাহলে কি করে চলবে বল্?

—তাই বলে এমন উচ্ছন্নবৃত্তি করে? তোমায় ত' বলেছি দাদা, আমি ত তুটো টিউশুনি করছি, আর না হয় একটা চাকরী যোগাড় করে দাও। আমি ত কিছুদিন অন্ততঃ চালাই। তারপর তোমার একটু নাম হলে....?

—তুই আর কি চাকরী করবি বোন? আর পনের টাকার যে তুটো টিউশুনি করছিস্ তাতে আর ক'দিন চলবে? আর তা ছাড়া আমি তোদের বড় ভাই আমার নিজের কি একটা কর্তব্য নেই?

—আছে, আছে দাদা, তোমার কর্তব্য যে সবার ওপরে। তুমি না দেখলে আমাদের দেখবে কে? কিন্তু তবু, তুমি যার সাধনায় নিজের জীবনপাত করে এগিয়ে চলেছ—সে সাধনায় যদি ব্যাঘাত করে তুমি সামান্য অর্থের জন্যে সবকিছু ভুলে গিয়ে সাধনাকে সিদ্ধির পথে না নিয়ে গিয়ে এমনি করে অপমান কর? তাতে কি তোমার মনস্কামনা কোনদিনও সিদ্ধ হবে?—দাদা, ব্রততী সুখেন্দুর কাছে সরে এল। কাতর জলভরা চোখে মুখখানা তুলে ধরল।—আমার বিদ্যে দাদা খুব বেশী দূর নয় তবু আমি যা জানি তাই সম্বল করে আমি দুটো টিউশুনি পেয়েছি। আর একটা কাজ আমি যোগাড় করে নিয়ে সংসার চালাব। তবু তুমি এমন করে নিজের প্রতিভাকে নষ্ট করে দিও না। ভগবান তোমায় ক্ষমতা দিয়েছেন তুমি যদি সে ক্ষমতাকে এমনি করে পদদলিত কর তাহলে তুমি ভগবানের কাছে শুধু দোষী হবে না, মানুষের সমাজের কাছেও দোষী হবে। আর একটু অন্ততঃ তুমি তন্ময় হয়ে সাধনা কর, দেখবে—একদিন তোমার সৃষ্টির প্রশংসায় সবাই চমকিত হয়ে উঠবে।

ব্রততী হাঁফাতে লাগল—তারপর আবার বলল—আমার কথার সত্যাসত্য সেদিনই দেখেছ একজিবিসনে। তোমার ছবি দেখে সবার প্রশংসা। এত প্রশংসা যখন তুমি পেয়েছ তখন নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ একদিন সেদিন তোমার আসবে।

সুখেন্দু শুধু অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল। কি আর বলবে? জানে ত সবই। কিন্তু ধৈর্য কই? সাময়িক যে জটিল সমস্যা এসে পড়েছে তাকে মেটাতে গিয়েই ত তার এই পন্থা অবলম্বন। না হলে....।

ব্রততী ছবিগুলো নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—এবারই কিন্তু শেষ দাদা। এর পর আর এরকম করলে আমি কিন্তু ক্ষমা করব না।

সুখেন্দুকে অক্ষমের মত ঘরে ফিরে আসতে হল। তার আর কোন উপায় নেই। যেটুকু অবলম্বন ছিল সেটুকুও গেল।

তারপর হঠাৎ আকস্মিক এল অনিমেশ মুখার্জীর আমন্ত্রণ। এতে কিন্তু ব্রততী খুসী হল। বলল—দাদা, এই হচ্ছে তোমার যথেষ্ট সম্মান।

সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু টাকা নিচ্ছি যে?

—তাতে দোষ কি? উচিত মূল্য ত পাচ্ছ? উচিত মূল্য না পেলে কিন্তু আমি যেতে দিতাম না।

সুখেন্দু হাসল বোনের কথায়। তারপর বলল—না মরে ছাড়বি না দেখছি।

তারপর এই।

মাত্র পাঁচ মিনিট সময়, ভদ্রলোককে কথা দেওয়া।

সুখেন্দু শেষ পর্য্যন্ত অনেক ভেবে এসপ্লানেড ট্রামডিপোর কাছে এসে উপস্থিত হল। হাতে সেই তার এক আনা পয়সা। মন তার কিছুতে চাইছিল না এক আনা পয়সাটা খরচ করতে। কিন্তু কি করবে উপায় নেই? ভদ্রলোকের কথা। তার ওপর তার এই প্রথম যথাযোগ্য মূল্য। আনন্দ! আনন্দ লাগে বৈকী? তার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের ওপর হঠাৎ আলোর স্পর্শ।

সে চলেছে কোন একটী সুন্দরী তরুণীর সুকুমার্য্য তনুর লীলায়িত ছন্দময় নৃত্য ভঙ্গিমার ছবি আঁকতে। আর তার পারিশ্রমিক এক-শত মুদ্রা। আজ তার গৌরব করাই উচিত কিন্তু মনটা বার বার তার কেন যেন পিছলে পিছলে পড়তে লাগল। আজ যেন আর তার কোন আনন্দ নেই। সব আক্ষেপ। কেন শিল্পী হতে গেলাম? কেন সাধক হওয়ার স্বপ্ন চোখে এল? সাধারণ মানুষ যেভাবে জীবন

যাপন করে। ছোট চিন্তা, ছোট গণ্ডী। সেইভাবেই কেন আর পাঁচজনের মত নিজেকে গড়ে তুললাম না?

ভবানীপুরগামী একখানা গাড়ী। যাত্রী উঠছে খুব কমই। তবু ভাবতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুখেন্দু। মাত্র পকেটে চারটে পয়সা। যদি এক্ষুণি ভবানীপুর যেতে তিনটে খরচ করে তাহলে একেবারে তার পকেট শূন্য হয়ে যাবে। অথচ চারদিন অনাহার। একটু জল পর্য্যন্ত খেতে পায়নি। শরীরে আর কোন বল নেই। ওয়েলিংটন থেকে এসপ্লানেড পর্য্যন্ত হেঁটে এখন সে মৃতপ্রায়। এরপর যদি সে আবার হাঁটতে সুরু করে তাহলে ভবানীপুর—রমেশ মিত্র রোডে অনিমেষ মুখার্জ্জীর বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত সে আর পৌঁছুতে পারবে না। মাঝ পথেই শুয়ে পড়বে।

ট্রামটা হঠাৎ এসপ্লানেড ডিপো ছাড়ল। আর না ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখেন্দুও তড়াক করে এক লাফে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়ল। কিন্তু ট্রামে উঠেই হঠাৎ সুখেন্দুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

ট্রামের ভাড়াটা ফাঁকী দিলে কেমন হয়? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দুটো একবার ট্রামের কামরার চারদিকে ঘুরে গেল। কণ্ডাক-টারটি কোথায় অবস্থান করছে? ও দেখল একটু দূরে কণ্ডাকটারটি দাঁড়িয়ে আছে। এখনও টিকিট কাটতে সুরু করে নি। সুখেন্দু বসে বসে ভাবতে লাগল—ভাড়াটা কি মারা যায় না? যদি মারতে পারত, তাহলে দুপয়সা কিছু কিনে খেয়ে গিয়ে অনিমেশ মুখার্জ্জীর বাড়ীতে ঢুকত! দুটো চোয়াল এত ব্যথা হয়েছে। মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না।

কিন্তু কি করে সম্ভব? এতখানি রাস্তা। অনেকক্ষণ ট্রামে বসে থাকতে হবে। এখুনি হয়ত কণ্ডাকটার এসে ক্যাঁক করে গলাটা টিপে ধরবে। তখন পকেট থেকে আনিটা বার করে সুড়সুড় করে তার হাতে দিতে হবে।

ভাবতে ভাবতে সুখেন্দু ঘেমে উঠতে লাগল।

পটে আঁকা ছবি

ডানদিকে গড়ের মাঠ। উন্মুক্ত সবুজ গালিচা বিছানো মাঠ। কিছুটা দূরে ইটবারকরা কেল্লার উঁচু উঁচু প্রাচীরগুলো। মাঠে দুপুর বেলা অসংখ্যক গরুর পাল। খুঁটে খুঁটে তারা ঘাস চর্ব্বন করছে।

অনেকদূর থেকে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে। জাহাজের ইষ্টিমারের সিটি শোনা যাচ্ছে।

ট্রাম চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। হলদে রোদ্দুর। পিচঢালা রাস্তার ওপর পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। মাঝে মাঝে তিরিশ মাইল স্পীডে গাড়ী যাচ্ছে। বাঁ দিকের বড় বড় বাড়ীগুলো তাদের দীর্ঘ দেহগুলো নিয়ে ঝিমুচ্ছে।

শিল্পী সুখেন্দু হঠাৎ যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ল। কেমন যেন আঁকায় তাকে পেয়ে বসল। বার বার সে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। চারিদিকে দৃশ্যসম্ভার তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ কণ্ডাকটার কখন তার কাছে এসে পড়েছে ও বুঝতে পারেনি।

—টিকিট ?

ফ্যাল ফ্যাল করে সুখেন্দু কণ্ডাকটারের দিকে তাকিয়ে আনিটা পকেট থেকে বার করে তার হাতে দিল।

—তিন পয়সা।

কণ্ডাকটার টিকিটটা আর পয়সাটা দিয়ে এগিয়ে গেল।

হাতে হলদে তিন পয়সার টিকিটটা আর একটা পয়সা অবশিষ্ট নিয়ে বোবার মত হাঁ করে কণ্ডাকটারের দিকে তাকিয়ে রইল সুখেন্দু অনেকক্ষণ।

অনিমেশ মুখার্জ্জীর বাড়ীর দরজা। দরজার গায়েই নাম প্লেটে লেখা—ডাঃ অনিমেশ মুখার্জ্জী, [illegible] ([illegible])।

পটে আঁকা ছবি

দরজার কড়াটা ধরে দু-চারবার সুখেন্দু নাড়তেই চাকর মত একটা লোক এসে দরজাটা খুলে দিল।

—কাকে চান?

—অনিমেশবাবু আছেন?

—কে ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, ডাক্তার অনিমেশ মুখার্জ্জী।

—আপনি কোথথেকে আসছেন?

—বল আর্টিষ্ট সুখেন্দু বোস এসেছেন?

—ও আপনি আর্টিষ্টবাবু? আপনার জন্যেই বাবু অপেক্ষা করছেন। এই বলে চাকর মত লোকটা সুখেন্দুকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

খানিকটা যেতেই একটা ঘর। বোধহয় সেটা ড্রয়িংরুম। গোটা কয়েক কৌচ পাতা। ব্লু ডিসটেম্পার করা ঘরটা। নিখুঁত, সুন্দর, ঝকঝকে। দেয়ালে একটা বার্ম্মাশেলের ক্যালেণ্ডার। কয়েকটা চেয়ার, মাঝখানে একটা বড় টেবিল। ঘরে কেউ ছিল না। চাকর মত লোকটা সুখেন্দুকে বসতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই অনিমেশ মুখার্জ্জী ঢুকলেন। হাতে একটা মোটা বই, সম্ভবতঃ ডাক্তারীর।

চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশটী বছরকে পিছনে ফেলেছেন ভদ্রলোক। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত একটী চিন্তাক্লিষ্ট মানুষ। ফর্সা, বেঁটে, ছোটখাট মানুষটী। কপালের ওপর অজস্র বলিরেখা। মুখখানি পরিষ্কার সুন্দর করে "সেভ" করা। পরনে একটী রঙীন ঢাকাই লুঙ্গী। গায়ে একটা কাটা গেঞ্জি। গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে বুকে দেখা যাচ্ছে অজস্র লোমের সমারোহ। পুরুষের চিহ্ন। পায়ে একটী হরিণের চামড়ার স্লিপার।

ঘরে ঢুকেই হাসিমুখে বললেন—টু লেট আর্টিষ্ট। আমি ভাবছিলাম হয়ত ভুলে গেলেন?

সুখেন্দু হাসল, বলল—না ভুলিনি। একটু দেরী হয়ে গেল।

অনিমেশবাবু আর কিছু বললেন না। হঠাৎ তিনি চীৎকার করে ডাকলেন—রামু, সুচিকে পাঠিয়ে দে ত, সুখেন্দুবাবু এসেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটী মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন সব জ্বলে উঠল। মনে হল—অন্ধকারে একটা সোনার কোন মূর্ত্তি এনে হাজির করলে যেমন দেখতে হয় জায়গাটা ঠিক তেমনি।

একটা জ্বলন্ত কয়লার টুক্‌রো যেন। ধক্ ধক্ করে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

শিল্পী সুখেন্দুর চোখ দুটো কেমন যেন জ্বালা করে উঠল। যেন তার তুলির রঙ উপযুক্ত জায়গায় না দিয়ে কে যেন অনুপযুক্ত জায়গায় অপর্য্যাপ্তভাবে ঢেলে দিয়েছে।

একটা গোলাপী পাপড়ীরঙা মেয়ে। পেঁচানো পেঁচানো সরু সাপের মত ঢেউ খেলান দেহ। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখলেই মনে হয় যেন বিধাতা একে নাচবার জন্যেই মর্ত্ত্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেহটা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য কিন্তু রুচিবোধটা এত নীচুগামী যে দেখলে তার দেহের অদ্ভুত ভঙ্গীমাটা আর চোখে পড়ে না।

উগ্র প্রসাধনে মুখখানার অনেকখানি বিকৃতপ্রায়। কোমলাংশ, লালিত্য প্রায় অদৃশ্য। গোলাপী ঠোঁটে আরও খানিকটা লিপষ্টিকের রঙ চড়ানো। গালে বেশ কটু লালের পোঁচ। মোটা করে চোখে সুরমা না কাজলটানা। চুলটাই সবচেয়ে দেখবার মত। অদ্ভুত-ভাবে কপালের সামনে চুলটা ঘোরানো।

পরণে একখানা দামী সাড়ী। পুরুষ্টু বুকখানার ওপর কাপড়ের আঁচলটা এমন ভাবে দেওয়া। যেন মনে হয়, না দেওয়ার ইচ্ছেই ছিল।

সুখেন্দু অবাক হয়ে গেল সুচরিতাকে দেখে।

এতদিন ধরে ছবি আঁকছে সে। কিন্তু এমন ছবি কোনদিন

কল্পনাও করে নি। সত্যি মানুষ না হয়ে যদি ছবি হত সুচরিতা—তাহলে এখুনি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে সে ফেলে দিতে পারত।

এমন ছন্নছাড়া ভাবে রঙগুলোকে বাজে জায়গায় লাগান! এত সুন্দর দেহ, এমন সুন্দর ছবি। শুধু কতকগুলো বাজে রঙ খাটিয়ে সৃষ্টিটার অবমাননা করা!

সুখেন্দুর ইচ্ছা করতে লাগল—এখুনি সুচরিতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জল দিয়ে সব রঙটঙগুলো মুখ থেকে ধুয়ে মুছে দেয়। তারপর শুধু একখানা সাদা সাড়ী পরিয়ে ভুরু দুটো তুলি দিয়ে এঁকে ছেড়ে দেয়।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার দরুণ অনিমেশবাবু একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। তারপর পরিবেশটা কাটাবার জন্যে বললেন—এই আমার মেয়ে সুচরিতা। যদিও পরিচয় না দিলেও পরিচয়টা একরকম দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। সুখেন্দু আর সুচরিতার দৃষ্টি বিনিময়ে।

বাবা পরিচয় দিতে তাই সুচরিতা হাসল, বলল—আর তোমার পরিচয় দিতে হবে না বাবা। উনি বুঝতেই পেরেছেন।

সুখেন্দুও হাসল। তারপর বলল—সুচরিতাদেবী দেখছি খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারেন!

আত্মপ্রশংসায় মনে হয় সুচরিতার সুতীক্ষ্ণ নাসিকা আরও একটু স্ফীত হল। কিন্তু বোঝা গেল না তার হঠাৎ মুখখানা ঘুরিয়ে নেওয়াতে। কিছুটা নিস্তব্ধতার পর ও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—একটু বসুন, আমি চা করে নিয়ে আসি।

. অনাহার, চা কেন যে-কোন কিছু পানীয় দ্রব্য হলেই যথেষ্ট। কিন্তু হঠাৎ দুপুর বেলা চায়ের কথা শুনে সুখেন্দু বিস্মিত হল, হয়ে বলল—বলেন কি? এই দুপুর বেলা—চা?

থমকে দাঁড়াল সুচরিতা। তারপর হেসে বলল—চা নয়, তবে কি খাবেন?

হঠাৎ সুখেন্দুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কিছু নয়। আপনি বসুন ত, ব্যস্ত হবেন না!

অনিমেশবাবু বললেন—তা কি হয় আর্টিষ্ট? এতখানি রোদ্দুরে এলেন। কিছু অন্ততঃ মুখে দিয়ে শান্ত হয়ে নিন। তারপর ত পরিশ্রম করতে হবে অনেকক্ষণ।

সুখেন্দু তবু নিষেধ করল। বলল—না না, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি বেশ শান্তই আছি।

সুচরিতা শেষ পর্য্যন্ত একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। বসতে বসতে বলল—বাব্বা, আচ্ছা মানুষ দেখছি। না বললে হ্যাঁ করার উপায় নেই।

সুখেন্দু হাসল। রোদে পোড়া ঝলসান একটা মুখ। অনাহার-ক্লিষ্ট, শুষ্ক, মৃতপ্রায়। সুচরিতার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে পারছিল না। কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। মাথা ঘুরছিল সুখেন্দুর। চোয়াল দুটো দারুণ ব্যথা। হ্যাঁ করে কথা বলার অসুবিধে।

সুচরিতা কিন্তু দেখছিল সুখেন্দুকে। দেখতে দেখতে এক সময় মৃদু হেসে বলল—আপনাকে আমি চিনলাম কেমন করে বলুন ত?

সুখেন্দু বলল—কেমন করে বলব বলুন?

সুচরিতা বলল—আমাদের ডান্স পার্টিতে সুমিতা—সুমিতা সান্যাল, তার বাড়ীতে আপনার আঁকা একখানা ছবি দেখেছিলাম। আঃ ছবিটা যে কি সুন্দর! সেই ছবি দেখেই ওর কাছ থেকে আপনার প্রতিভার খবর পাই। একজিবিসন থেকে দশ টাকায় ছবিটা কিনে এনে ও আরও কয়েকটা টাকা খরচ করে বাঁধিয়েছিল। আমি ওকে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলাম। ও সখের জিনিষ বিক্রী করা নিষেধ বলে আমাকে তাড়িয়ে দিল। শুধু আপনার ঠিকানা দিয়ে বলল—এই ভদ্রলোকের ঠিকানাটা একজিবিসন থেকে নিয়ে এসেছিলাম। তোকে দিয়ে দিলাম। যদি পারিস ত খোঁজ করে তাঁর কাছ থেকে অন্য একটা ছবি আনিয়ে নে।

বাবাকে বললাম। বাবা আইডিয়া দিলেন—আমার একটা ডান্সিং পোজের ফটো আঁকবার জন্যে। তাই আপনাকে ডাকা।

সুচরিতা বলে থামল। তারপর বলল—আপনার আঁকার সমস্ত সরঞ্জামাদি কিন্তু আমার ঘরে সাজান আছে।

সুখেন্দু বলল—বেশ। আমিও প্রস্তুত। আপনার যদি অসুবিধে না হয়, যথাস্থানে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন?

অনিমেশবাবু বসে বসে সেই মোটা বইটা থেকে খুঁজে খুঁজে কি যেন সব উদ্ধার করছিলেন। হঠাৎ চোখ দুটো তুলে মৃদু হেসে বললেন—কথাবার্ত্তা শুনে বাইরের লোকেরা ঠিকই অনুমান করবে যে, দুজন শিল্পীই কথা বলছে। এই বলে আবার তিনি চোখ-দুটো সেই মোটা বইটার ভেতরে ঝুলিয়ে দিলেন।

সুখেন্দু, সুচরিতা দুজনেই হাসল। তারপর সুচরিতা বলল—চলুন সুখেন্দুবাবু, আমরা ওপরে যাই।

সুখেন্দু উঠে দাঁড়াল। বলল অনিমেশবাবুর দিকে তাকিয়ে—তাহলে আমি···।

কথা শেষ হবার আগেই অনিমেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ, আপনি যান। সুচরিতাই এবার আপনার সব ভার নেবে।

সুখেন্দু সুচরিতার পিছু নিল।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সুচরিতা মৃদু হেসে বলল—আপনার কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল—না?

সুখেন্দু কোন উত্তর দিল না।

—আমি অবশ্য আন্দাজই করেছিলাম। এত জীবন্ত ছবি যে আঁকতে পারে, তাঁর বয়স কখনই প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করে নি। আমার অনুমান ভুল নয় এবার দেখেই বুঝতে পারছি।

সুখেন্দু হাসল।

সুচরিতা আবার বলল—বাবার সঙ্গে ত আমার এই নিয়ে রীতিমত তর্ক।

বাবা বললেন—তোর কথা শুনে আর তাঁর ছবির প্রশংসা শুনে মনে হচ্ছে—ভদ্রলোকের বয়স যথেষ্ট কম নয়। কারণ কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে গেলে পরিণত বয়স অবশ্যই প্রয়োজন। তাই আমার মনে হচ্ছে—ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের ঊর্দ্ধে।

এই নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার কম তর্ক হয়েছে! আমি বললাম—না, তোমার এ কথা আমি মানতে রাজী নই। সুমিতাদের বাড়ীতে ভদ্রলোকের আঁকা ছবি দেখে আমি বুঝেছি ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশী নয়, আর তা ছাড়া মানুষের যৌবন গেলে আর কোন রসই থাকে না। সুতরাং আপনার ছবির মধ্যে যে রসের খনি দেখেছি, তাতে আমার দৃঢ় ধারণাই হয়েছিল যে আপনি প্রৌঢ় নন। যুবক। এবং যৌবন আপনার যায় নি। যৌবন আপনার সবে এসেছে।

সুচরিতা আবার হাসল, বলল—বাবা অবশ্য বাজী রেখে হেরে গেছেন। তিনি আপনার বাড়ী থেকে ঘুরে এসেই আমাকে বলেছেন—সুচি আই অ্যম ফেলিওর। একশ টাকাই আমার জলে গেল। অর্থাৎ বাবার সঙ্গে আমার এই কথাই হয়েছিল যে, আপনি যদি যুবক হন তাহলে আমি একশ টাকা জিতব, এবং সেই টাকা আপনাকে দিয়ে আমার একটা ডান্সিং ছবি আঁকিয়ে নেব। আর যদি হারি অর্থাৎ আপনি যদি প্রৌঢ় হন, তাহলে আমি একশ টাকা দিয়ে একটা টি পার্টি দিয়ে টাকাটা বাজীর হার হিসাবে খরচ করব।

কিন্তু বাবা হেরে গেলেন। আমার অনুমানই ঠিক।

কথা বলতে বলতে সুচরিতা ওপরে নিজের ঘরে সুখেন্দুকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সুখেন্দুর চোখ ঝলসে গেল। চারিদিকে শুধু সুচরিতা। নানা ধরণের ডান্সিং পোজের ফটো ঘরের চারিদিকে কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে করে ঝোলান।

সুচরিতা বলল—বসুন!

সুখেন্দু হাঁ করে ঘরের দেয়ালগুলো দেখতে দেখতে সুচরিতার খাটটার ওপর থপ করে বসে পড়ল।

তারপর অস্ফুষ্টস্বরে বলল—কিছু মনে করবেন না, এ সব ছবিই কি আপনার ডান্সের সময় তোলা ?

সুচরিতা প্রশ্ন শুনে যেন একটু ইতস্তত করল উত্তরটা দিতে। কারণ যে সব ছবিগুলো ঘরে টাঙান রয়েছে, সে সব ছবিগুলো ষ্টেজে ডান্সের সময় তোলা নয়, কারণ সুচরিতার অনেকগুলো ভঙ্গি সাধারণের চোখে দেখবার মত ছিল না। এক নোংরার দিকে তাকালে নোংরা মনে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা জাগে। আর যদি আদর্শ তাদর্শের বুলি আওড়িয়ে সুচরিতার ফটোর ভঙ্গিগুলোকে নিতান্তই আর্ট বলে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে সুচরিতা প্রশংসা পাবারই যোগ্য! প্রথম সুখেন্দু আর্টের দোহাই দিয়ে সুচরিতার প্রশংসা করল। বলল—সত্যিই আপনার ভঙ্গির প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু মনে মনে সুখেন্দু সুচরিতার নোংরা রুচিবোধের সমালোচনা করল। বড়লোকের মেয়ে, যুবতী, ডান্সার। সুতরাং আর্টের দোহাই দিয়ে খানিকটা নোংরামোর পরিচয় দেবে—এতে আর বিচিত্র কি ?

কোন একটি ভঙ্গিমা, বুকখানা সামনের দিকে চিতিয়ে দিয়ে হাত দুটো পেছন দিকে মুড়ে যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ধরে আছে একটি তরুণ তার কটিবন্ধ। কোন একটি ছবিতে ছোট কষ্টিয়ুম পরে ছোট একটি বক্ষবন্ধনীর ওপর নির্ভর করে একটি তরুণের হাত ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আরও কত যে ছবি তার ইয়ত্বা নেই। বরং দেখতে দেখতে সুখেন্দুর লজ্জা করতে লাগল। এর চেয়ে যে আদিম যুগে ফিরে যাওয়া ভাল ছিল। কিংবা শ্রীকৃষ্ণের মত গোপিনীদের কাপড় হরণ করে মজা দেখা। তাতে ক্রীড়াসুলভ চপলতা ছিল আর একটু না হয় নোংরামোর উঁকি ছিল। তবু মনে হয় সে সব ছবি দেখলে অত লজ্জা লাগে না। বরং মনে হয় এর মধ্যে যেন কোথায় একটা আর্টের ছোঁয়াচ লুকিয়ে আছে। কিন্তু

সুচরিতার এ বিভিন্ন ছবি দেখে সুখেন্দু কিছুতে মনকে প্রবোধ দিতে পারল না। হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করল—সুচরিতা দেবী, আপনার বাবা কি কোনদিন এ ঘরে আসেন নি?

সুচরিতা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ও বিস্মিত হয়ে বলল—আচ্ছা সুখেন্দুবাবু, আপনি আর্টিষ্ট? আপনিও কি পুরনোপন্থী?

সুখেন্দু বলল—না। বলছি, আপনি যে রকম কায়দায় ঘরটা সাজিয়ে রেখেছেন তাতে দেখে মনে হচ্ছে যে আপনার রুচিবোধটা সাধারণের যোগ্য নয়।

এ কথা বলতে সুচরিতা একটু কেন বেশ ক্ষুব্ধ হল, বলল—আর্টটাই কি সাধারণের বোঝার জিনিষ, যে যোগ্য অযোগ্যের প্রশ্ন আসবে? তারপর হঠাৎ চুপ করে হেসে বলল—কিছু মনে করবেন না সুখেন্দুবাবু? হঠাৎ আপনার সঙ্গে তর্ক করতে সুরু করে দিয়েছিলাম। তবে আপনি যা বললেন। আমার রুচিবোধ বর্ত্তমান যুগকেই অনুসরণ করে চলেছে জানবেন।

সুখেন্দু চুপ করে রইল। সে আর তর্ক করতে চাইছিল না। কারণ তার ভীষণ গা বমি বমি করছিল। আর তা ছাড়া সুচরিতা প্রথম আলাপেই যে সমস্ত প্রশ্নের ঢেউ তুলেছে, তাতে তর্ক অবশ্য যথেষ্ট করা যায়। কিন্তু সময়ের দরকার আর পরিশ্রমের দরকার। যদি এ দুটো জিনিষ সে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করতে পারত তাহলে সুখেন্দু তর্কের বন্যা ছুটিয়ে একবার দেখিয়ে দিত—কি ঠিক আর কি ঠিক নয়?

তাই সুচরিতার কোন কথার সে উত্তর দিল না। শুধু মনে মনে ভাবল—মানুষ আহার করলে সেই আহারের যে শক্তি প্রকাশ পায় এবং সেই শক্তি ক্ষয়ের জন্য যে পরিশ্রম করতে হয়, সুচরিতা সেই পরিশ্রম করে ক্ষয় সাধনের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। আসলে ওর এসব তর্কের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। সুতরাং চুপ

করে থাকাই শ্রেয়। কারণ তার সে অতিরিক্ত আহার্য্যও নেই, ক্ষয় করবার শক্তিও নেই। "যা ভাল তাই ভাল", "যা মন্দ তাই মন্দ" এই মতই সব জায়গায় খাটানই ভাল। আর্টকে সে ভালবাসে, তাই আর্ট করে। আর্টের জন্য তার প্রাণের মধ্যে একটা প্রেরণা জাগে, তাই সে দিন রাত তার চিন্তাতেই বিভোর থাকে। তবে আর্টের কটা শিরদাঁড়া আছে প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিতে পারবে না, কারণ আর্টের অন্তর তার জানা, বহিরাবরণ তার জানা নেই।

সুচরিতাকে বলল ও—কই আপনার ক্যানভাস, তুলি, পেণ্ট এনে হাজির করুন? আজ অন্ততঃ প্রাথমিকটা ত সেরে যাই! পাঁচটার কাছাকাছি বোধ হয় বেজেছে।

সুচরিতা আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল—না সুখেন্দুবাবু আজ থাক্। আজ ছটায় আমার নিউ এম্পায়ারে শো। কাল থেকেই সুরু করা যাবে। রোববার আছে, বেশ হবে—কি বলেন? আজ বরং এক কাজ করুন, আমার ত শো কোনদিন দেখেন নি! আমার সঙ্গে গিয়ে শোটাই দেখে আসবেন। আপনারা আর্টিষ্ট মানুষ! আমার ডান্সের মধ্যে থেকে যদি কোন ছবি আঁকার খোরাক পান......?

সুচরিতার কথাগুলো ভাল। খুব বেশী কান জ্বালা করে না শুনলে। কিন্তু চেহারার দিকে তাকালেই—মনে পড়ে যায় কোকিলকে। তবু কোকিল সে রূপহীন। তবু তাকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু সুচরিতার নিজের রূপকে এমন বিকৃত করার জন্য যেন ওকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। আর বিশেষ করে আর্টিষ্ট সুখেন্দু ক্ষমা করতে পারল না, কারণ যেখানে সেখানে রঙ ঢেলে সৌন্দর্য্য বাড়ানর প্রয়াস। সুখেন্দুর সেইখানেই মতবিরোধ। নিতান্ত অর্থের জন্য বাধ্য হয়ে আলাপ করে বসে থাকতে হল বলে, না হলে অনেক আগেই সুখেন্দু উঠে চলে যেত।

তাই শো দেখার নিমন্ত্রণ করতে সুখেন্দু খুব জোর জোর মাথা নাড়তে লাগল। কারণ পাছে কম মাথা নাড়লে সুচরিতা চেপে

ধরে। এইজন্যে খুব ঘন ঘন মাথা নেড়ে একেবারে অস্বীকার করতে চেষ্টা করল।

সুচরিতা একটু যেন মনক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু সুখেন্দু দেখেও খুব বিশেষ লক্ষ্য দিল না। হতে পারে সে অর্থশালী নয়, উপার্জ্জন-ক্ষম নয়, কিন্তু মনুষ্যত্ব ত আছে! যে মনুষ্যত্বের জোরে প্রতি মানুষ তার ভূলুণ্ঠিত মাথা ঊর্দ্ধগামী করে চলে!

সুখেন্দু উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াতে সুচরিতার আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগল। মুখটা তার একটু আরক্ত হয়ে উঠল। বলল—জানেন এই ডান্স দেখবার জন্যে লোকে পাগল হয়ে ছোটাছুটি করে! আর আপনি আমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে এই ডান্স না দেখে চলে যাচ্ছেন? আপনি কি কোনদিন আমার নাম শোনেন নি?

সুখেন্দু ম্লান হাসল, বলল, শুনেছি, আমার বোন আপনার ডান্সের কথা আমাকে বলেছে। সে দেখেছে আপনার ডান্স, আমি দেখিনি।

—আপনি যে দেখেননি সে বুঝতেই পাচ্ছি। দেখলে কি আর আমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারতেন? জানেন? এই কোলকাতা সহরে একজন অলবেঙ্গল চাম্পিয়ান বলে আমার কত নাম?

—অস্বাভাবিক অবশ্য কিছু নয়। নাচিয়েদের নাম খুব তাড়াতাড়িই হয়।

ঔদ্ধত্য আর সহ্য করা যায় না। কি অহমিকা? একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবী পড়ে, একমাথা চুল নিয়ে একটা ভিখিরী তার মুখে এই সব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! সুচরিতার সব শরীরটা রি রি করতে লাগল। এত কিসের অহঙ্কার? লাল কাল সবুজ রং দিয়ে কাগজের বুকে আঁকিবুঁকি কাটতে পারে বলে এত অহমিকা? এ রকম আঁকিবুঁকি কি কেউ কাটতে পারে না? না হয় কয়েকটা এক-

জিবিসনে কয়েকটা ছবি ফার্ষ্ট হয়েছে। না হয় সবার চেয়ে একটু নয় ওপরে। তাই বা কি এমন ?

অন্য পরিবেশে হলে হয়ত সুচরিতা ষ্টেজে নামবার সময় যেমন উপেক্ষার ভঙ্গিতে দর্শক সাধারণকে দেখত, তেমনি করে তাদের দলের মধ্যে সুখেন্দুকে ঠেলে ফেলে দিতে পারত কিন্তু হঠাৎ যেন এ একটা অন্য পরিবেশের সম্মুখীন সে হয়ে পড়েছে বলে মনে হল। আর সেখানে সুখেন্দু একটা অন্য পরিবেশের মানুষ।

তবু একটু সুচরিতা নিজেকে দমিয়ে "ভিখিরী" শব্দটা মনে মনে কয়েকবার আউড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। যদি খানিকটা ঘৃণা এসে মানুষটাকে অবজ্ঞা করা যায়। যেন বোঝান যায় একে, যে তোমার যোগ্য আসনের চেয়ে তুমি উঠেছ অনেক ওপরে, সুতরাং আর ওঠার চেষ্টা কর না। কিন্তু সুখেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে সুচরিতাকে বার বার ঘৃণা ভুলতে হল।

কারণ, তবু যেন সুখেন্দুকে অবজ্ঞা করা যায় না। ছেঁড়া জামা কাপড়, অপরিষ্কার দেহ, একমাথা চুল, কতদিন দাড়ী কামায়নি। কোটরগত চোখ, ভাঙ্গা গাল, গলার কণ্ঠা দুটো "রণং দেহি" হয়ে জেগে উঠেছে। তবু যেন তারও মধ্যে থেকে কি একটা আকর্ষণ ? ভাষায় তাকে লিপিবদ্ধ করা যায় না। মুখে একটা এমন দৃঢ় ভাব যে সুচরিতার মত দেড়শ নাইট ষ্টেজে ডান্স দেওয়া মেয়েও উপেক্ষা করতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে সুচরিতা আস্তে আস্তে বলল—বেশ, ডান্স দেখতে যাবেন না, একটু চা ত খেয়ে যাবেন ?

সুখেন্দু হাসল, বলল—বেশ দিন! কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি নিন। আপনার ত এক্ষুণি সময় হয়ে যাবে।

সুচরিতাও হাসল, বলল—দেরী হলেও ক্ষতি নেই। না হয় অডিটোরিয়ামটা চোখের জলে ভাসাবে!

তারপর সুখেন্দু চা জলখাবার খেয়ে সেদিনকার মত বিদায় নিল। কথা দিল পরদিন ঠিক বারটায় এসে উপস্থিত হবে।

পরদিন বারটা।

সুচরিতা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল সুখেন্দুর জন্যে। ওর মুখে আজকে একটা দারুণ খুসীর ঔজ্জ্বল্য। এমন কি ভাল করে দেখলে বোঝা যাবে মেঘলা দিনে সূর্য যেমন এক এক সময় উঁকি দিয়ে মেঘের ভেতর ঢুকে যায়—তেমনি ওর মুখে এক দুষ্টুমির সূর্য্য।

অনিমেশবাবু ঘরে বসে আগের দিনের বইটা পড়ছিলেন। সুচরিতা এক সময় বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—বাবা আর যাই বল, লোকটার কিন্তু কথার ঠিক নেই। ঘড়িতে দেখ, বারটা বেজে চার—অথচ এখনও তার টিকিটি দেখার উপায় নেই।

অনিমেশবাবু হাসলেন, বললেন—তোদের আর্টিষ্ট লাইফ। আর কি বলব বল? তোরাই বরং তোদের আচরণগুলো ভাল করে দেখ।

ওদিকে কিন্তু সুখেন্দুকে নিয়ে ব্রততীর ভীষণ জ্বালা। সে কিছুতে সুচরিতাদের বাড়ীতে আসবে না। আগের দিনের ঘটনার সব আদ্যোপান্ত সুখেন্দু ব্রততীকে বলেছিল। ব্রততী শুনে বলেছিল—একটু ধৈর্য্য ধর দাদা। ওরা বড়লোক, অহঙ্কার যে ওদের থাকবে এ ত নতুন কথা কিছু নয়। তবু তোমাকে ওদের অহঙ্কার সহ্য করেও মিশতে হবে। কারণ জগতে ওদের স্থানই সবচেয়ে উঁচুতে। তোমাকে উঠতে গেলে ওদের চূড়ো ধরেই উঠতে হবে।

তবু কিন্তু অবুঝ সুখেন্দু মানতে চাইল না। যত বোঝায় ব্রততী, তত সুখেন্দু বেঁকে বসে।

সুখেন্দু বলল—তুই কেন বুঝতে পাচ্ছিস্ না ব্রত? ঐ নাচিয়ে মেয়েটা কিছুতে ছবি আঁকাবে না। দুচারদিন ধরে নিয়ে গিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে, তারপর ছেড়ে দেবে। আমি দেখে বুঝেছি ওর ঐ রকম আবভাব। এই ত কাল গেলাম, আমাকে ছটা পর্য্যন্ত ধরে রাখল। তারপর বলল—আজ আমার নিউ এম্পায়ারে একটা শো আছে, আপনি দেখতে যাবেন? এতে রাগ হয় না? আমি গেলাম কোথায় ছবিটা আঁকব। মন দিয়ে ফুটিয়ে তুলব তার হুবহু আকৃতিটা। তা নয় ছটা পর্য্যন্ত আট্‌কে রেখে বলে দিল আজ আর ছবি আঁকা হবে না। এ সব খেয়াল খুসী মন নিয়ে কি ভাল লাগে?

ব্রততী হাসল, বলল—দাদা, তুমি দেখছি সবাইকেই তোমার বাড়ীর মত ভাববে। ওরা পয়সা দেবে, ওরা যখন পয়সা দেবে তখন তুমি ওদের দাস। ওরা যদি ছবি না আঁকিয়ে বসিয়ে রাখে তাতে তোমার কি? তোমার পয়সা পেলেই ত হল?

সুখেন্দু বলল—তা তুই কি মনে করিস্ ওরা ছবি না আঁকিয়ে আমার মুখ দেখে পয়সা দেবে?

ব্রততী চুপ করে রইল। তার পর কিছুক্ষণ ভেবে বলল—আচ্ছা, আজ ত যাও! তার পর এ রকম যদি আজ দেখ, না হয় এরপরে আর না যেও।

সুখেন্দু বলল—তবু তুই আমাকে যেতে বলবি ব্রত?

—কি করব বল দাদা? তুমি যে বোঝ না। তুমি বোঝ না বলেই ত আমার বেশী ভাবতে হয় তোমার জন্যে। তোমার সেই পথে দাঁড়িয়ে ছবি বিক্রীর চেয়ে ত এর সম্মান আছে? অন্ততঃ দুটো বড়লোক মানুষের সংস্পর্শেও ত আসতে পাও?

—তুই কি মনে করিস্ আমি বড়লোকদের জন্যে ছবি আঁকি?

তাদের প্রশংসা কুড়াবার জন্যেই আমার এতদিন ধরে সাধনা! সুখেন্দুর স্বরে বেশ খানিকটা ঝাঁঝ।

ব্রততী দাদার ক্ষুব্ধতা দেখে নিজের গলার স্বর খাদে নিয়ে এল। বলল—না দাদা, তা কেন? এ সব ভুল ধারণা নিয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত কর না। তোমার সাধনা বড়লোকদের জন্যে হতে যাবে কেন? আর তা ছাড়া ওরা বোঝেই বা কি? গোবরপোড়া মাথায় ওরা শুধু অতিরিক্ত ফাঁকা প্রশংসা দিতেই জানে। আসলে কি ওদের প্রশংসার কোন দাম আছে?

—তবে তুই কেন আমাকে বলছিস্ ওদের সংস্পর্শে যেতে?

ব্রততী হাসল দাদার ছেলেমানুষী দেখে, বলল—তুমি দাদা দেখছি একটুও বোঝ না! বলছি তার কারণ, ওদের একটু সংস্পর্শ না পেলে তোমার যে অন্ধকারত্ব ঘুচবে না! আজকে কেন চিরকালই ওদের আলোয় পথ আলোকিত করতে হয়।

এবার যেন সুখেন্দু ব্রততীর কথার অর্থটা একটু একটু বুঝতে পারল, খুসী হয়ে হেসে বলল—সত্যি ব্রত, তোর এত বুদ্ধি! আমি একটুও বুঝতে পারি না।

ব্রততী এবার দাদার প্রশংসায় নিজের আরক্ত মুখটা নামাল। বলল—বোঝ তুমি সব দাদা, শুধু আমার কাছে না বোঝার ভাণ কর।

সুখেন্দু হাসল। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবল। তারপর বলল—জানিস ঐ মেয়েটার সামনে যেতে কেমন যেন বিরক্ত লাগে? ঘরের মধ্যে বসে আছে মুখে এক গাদা পেণ্ট! কি বিশ্রী রঙের টাচ্? আমার ত ইচ্ছে করছিল, রঙটা সব তুলে দিই। দিয়ে আস্তে করে একটা তুলির দু একটা টান মুখের ওপর দিয়ে দিই, যাতে সৌন্দর্য্যটা সুন্দরতর হয়ে ওঠে।

ব্রততী সুখেন্দুর কথা শুনে হাসতে লাগল, বলল—দিলে না কেন? তাহলে মজাটা কি হত একবার দেখতে? সঙ্গে সঙ্গে আর্টিষ্ট মশাইকে একেবারে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বাড়ীর বার করে দিত। আর যাতে

ত্রিসীমানায় না আস তার জন্য ঠ্যাংটা দরওয়ানের লাঠি দিয়ে ভেঙ্গে দিত।

সুখেন্দু ব্রততীর কথায় হো হো করে হাসতে লাগল। বলল—না রে অতটা করত না। নাচিয়ে মেয়েটা গালে ঠাস করে একটা চড় মারত আমার, মেরে বলত—যান্ আর কোনদিন এদিকে আসবেন না? এইত কাল! আমাকে বলল—আমার সঙ্গে নাচ দেখতে চলুন না? আমি না বলতে কি রাগ? তখনই ভয়ানক লাগছিল—কি জানি যদি মারাত্মক কিছু করে বসে? বলা ত যায় না। ওরা সব পারে?

ব্রততী একটু চুপ করে ভেবে বলল—যাক গে আর ওসব কথা নিয়ে মাথা খারাপ করতে হবে না। তুমি যাও। বোধ হয় বারটা বাজে।

তখন বারটা পাঁচ।

অনিমেশবাবু সেই মোটা বইটা চোখের দ্বারা লেহন করছিলেন বসে বসে। আর সুচরিতা একখানা সচিত্র ডান্সের ম্যাগাজিন খুলে হাঁ করে বসে বসে দেয়ালের ওয়ালক্লকটার দিকে তাকিয়েছিল।

এমন সময় সুখেন্দু পর্দ্দাটা ঠেলে বলল—আস্‌তে পারি?

সুচরিতা হঠাৎ একরকম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—পারি মানে, আসুন!

সুখেন্দু ঘরে ঢুকল।

সুচরিতা বলল—এই কি আপনার ঠিক বারটা?

নিরুত্তরে সুখেন্দু ওয়ালক্লকটার দিকে তাকাল। তারপর বিস্মিত হয়ে সুচরিতার দিকে তাকাল।

সুচরিতা বুঝতে পেরে বলল—হ্যাঁ পাঁচ মিনিট। কিন্তু এই পাঁচ মিনিট কি কম সময়? জানেন এই পাঁচ মিনিটে এই এটমের যুগে একটা বিরাট মহাদেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে?

সুখেন্দু একটু ইতস্ততঃ করে বলল—তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দেরীর জন্যে।

এ কথায় হঠাৎ অনিমেশবাবু আহত হয়ে বইটা বন্ধ করে বললেন—আহা ক্ষমা কি? তুমিও ত হে আর্টিষ্ট নিতান্তই ভাল-মানুষ! বলতে পারলে না—এটা কি ইংরেজের দেশ—যে ঠিক একেবারে পানচুয়ালিটি বজায় রাখব?

সুচরিতা বলল—ডিসিপ্লিন এণ্ড পানচুয়ালিটি এটা ইংরেজের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এটা মানা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত।

অনিমেশবাবু বললেন—থাক্ থাক্ উচিত অনুচিত নিয়ে আর তোকে তর্ক তুলতে হবে না! তার চেয়ে বরং যা সুখেন্দুবাবুকে নিয়ে ওপরে যা। গিয়ে ছবি আঁকা সুরু কর!

সুচরিতা হাসল, একটু অভিমান জড়িত স্বরে বলল—বাবা না পারলে কেবল শুধু এইরকম অজুহাত দেবে?

তারপর সুচরিতা সুখেন্দুকে নিয়ে নিজের ঘরে এল। সুখেন্দু ঘরে ঢুকে দেখল—আঁকার সরঞ্জামাদি সবই ঘরের একটা কোণে রাখা। সুখেন্দু হঠাৎ ভীষণ খুসী হয়ে উঠল। কামার যেমন লোহা পিটতে পেলে দারুণ খুসী হয় তেমনি সুখেন্দু আঁকতে পেয়ে ভীষণ খুসী হয়ে উঠল। হেসে বলল—যাক্ আপনি দেখছি সবকিছুই থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন? এবার আপনার ইচ্ছে মত একটা পোজ নিয়ে দাঁড়ান ত।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সুচরিতা নিজের দেহের কাপড়টা টান মেরে খুলে ফেলল।

সুখেন্দু চম্‌কে উঠল সুচরিতার কাণ্ড দেখে। তারপর দেখল চেয়ে, সুচরিতার দেহে একটা কাল ভেলভেটের নাচের পোষাক। এদিকে গলার লকেটের কাছ পর্য্যন্ত অনাবৃত আর ওদিকে পায়ের অনেকখানি অনাবৃত। সাধারণ এ্যাংলো মেয়েরা যেরকম পোষাক পরে রাস্তায় বেরোয় ঠিক তেমনি।

সুচরিতা একটা হাত ওপর দিকে দিয়ে আর একটা হাত পেছন দিকে দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল—এই রকম হবে ত!

সুখেন্দু ক্যানভাসের কাছে এসে সুচরিতার দিকে আর্টিষ্টের চোখ দিয়ে নিখুঁতভাবে দেখল। তারপর বলল—হ্যাঁ হয়েছে, তবে এরকম ছবি কিন্তু আমি আঁকব না?

সুচরিতা আশ্চর্য্য হয়ে বলল—কেন?

সুখেন্দু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল—মডেল ছবি অনেকে এঁকে অবশ্য প্রাইজ পায়, বিদেশে পাঠালে টাকা পায়! আমি কিন্তু এ সব ছবি পছন্দ করি না। কারণ আমার আঁকার আর্টই হচ্ছে আর্টকে বিকৃত না করে সুন্দর করে প্রকাশ করা!

সুচরিতার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল, বলল—কেন? আমি কি এমন বিকৃত করেছি যার জন্যে এমন করে বলছেন?

সুখেন্দু চুপ করে রইল, তারপর বলল—যাই হক, আমি তর্ক করতে চাই না। আমি এ ছবি আঁকতে পারব না—মাপ্ করবেন। আর এক যদি জোর করে আঁকিয়ে নেন—তাহলে আমার নাম কখনও প্রকাশ করবেন না কথা দিন, তাহলে আমি এঁকে দিতে পারি?

সুচরিতা কোন কথা বলল না। তাড়াতাড়ি শাড়ীটা পরে নিয়ে বলল—বেশ, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি, যা ভাল হয় বাবাকে বলুন। আমি জানতুম আপনি আর্টিষ্ট মানুষ, আপনার মধ্যে কোন কুসংস্কার নেই।

সুখেন্দু সেই ঘরে বসে রইল। সুচরিতা বেরিয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণ পরে অনিমেশবাবুকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অনিমেশবাবু ঢুকেই সুখেন্দুকে বললেন—তাহলে যা শুনলুম সব সত্যি? আর্টিষ্ট মানুষ, শিল্পী মানুষ, তাদেরও কুসংস্কার আছে?

সুখেন্দু চুপ করে রইল।

সুচরিতা বলল—তাহলে আপনি ঐ পোজে ছবি আঁকবেন না?

—না।

—বেশ, আমিও ও ছাড়া ছবি আঁকাব না।

অনিমেশবাবু সুচরিতাকে চুপ করতে বললেন।

সুখেন্দু উঠে দাঁড়াল।

অনিমেশবাবু বললেন—না হয় একদিন ভেবেই দেখ না হে আর্টিষ্ট? কি আর এমন দোষের হবে? একটা ভাল চান্স?

সুখেন্দু চিন্তা করছিল। মনে পড়ছিল ব্রততীর মুখটা। সে কি "তাকে অন্যায় করেছ" বলবে?

আবার ভাবছিল, বাড়ীতে পুরো পরিবারটা অনাহারে। সে যদি এই জাতীয় ছবি আঁকে তাহলে একশ টাকা এখুনি উপার্জ্জন হয়ে যাবে। কিন্তু জীবনে সে এতখানি নীচে নেমে কখনও যায় নি। আজ যাবে? যতদিন ধরে সে ছবি এঁকেছে, ততদিন শুধু নির্জীবকে প্রাণ দান করার চেষ্টা করেছে। চিত্রকে সজীব করে আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ জীবন্তকে মৃতের রূপে ফোটানর জন্যে অনুরোধ! মডেল অবশ্য অনেকে আঁকে, এরকম অনুরোধ আজ নয়, অনেক দিনই এসেছে। তবে সেদিন সাথে অর্থের লোভ ছিল না, আজ অর্থের যোগ আছে।

কি করবে? সুচরিতার কুৎসিত ভঙ্গিমার ডান্সিং ছবিটা এঁকে দেবে? না আবার পথে গিয়ে মিশে যাবে? এর চেয়ে যে কলেজ স্কোয়ারের রেলিঙে দাঁড়িয়ে ছবি বিক্রী করা অনেক ভাল ছিল।

অর্থশালী! অর্থশালীর টাকা আছে বলে তারা যা বলবে তাই করতে হবে?

সুখেন্দু তারপর একসময় বলল—আচ্ছা, কাল এসে আপনাকে বলে যাব, আমি আঁকব কি আঁকব না?

সুখেন্দু পথে এসে দাঁড়াল।

ব্রততীর ওপর ওর রাগ হতে লাগল। ওর জন্যেই এই অপমান।

একটা কুৎসিত ঢঙের ছবি আঁকিয়ে নিয়ে একশ টাকা দেবে? আর এই করলেই নাকি সে বড় হবে? নাঃ ব্রতকে আজকে গিয়ে আচ্ছা করে বলতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য্য?

ব্রতকে বলবে কি? বাড়ী যেতেই ব্রত যে খবর শোনাল তাতে আর সুখেন্দুর ইচ্ছা করল না, ব্রতকে আর কিছু বলতে।

ব্রততী ম্রিয়মাণ হয়ে বলল—দাদা, ছোড়দা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে?

বয়সে ব্রততীর চেয়ে বড় সুখেন্দুর চেয়ে ছোট। এই বছর একুশ বাইশ বয়স। ব্রততীর মেজ ভাই ব্রতীন। ছেলেটা একবার ম্যাট্রিক দিতে গিয়েছিল। কিন্তু অত্যধিক বন্ধুবান্ধবের জন্যে সিংহ-দরজা থেকে তাকে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হয়েছে। আর দেয় নি। শেষকালে ঐখানেই ইস্তফা দিয়ে সেই বন্ধুবান্ধব নিয়েই একটা ড্রামাটিক ক্লাব খুলে বসেছে।

ঘরে পয়সা থাকুক আর না থাকুক তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। একবার খাওয়ার সময় দুপুরবেলা বাড়ীতে এসে উঁকি মারে। দেখে যদি জুটেছে তাড়াতাড়ি থালা পেড়ে বসে পড়ে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কতকগুলো ভাত গিলে আবার উধাও। তারপর একেবারে আসে রাত্রে—শেষ পাড়া নিশুতি হয়ে গেলে। মানুষেরা সুপ্তির কোলে ঢলে পড়লে ব্রতীন এসে হাজির হয়।

বাড়ীতে যা কিছুই হোক্ সেদিকে ব্রতীনের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

ব্রততী ব্রতীনকে ছোড়দা বলে। যদিও মেজ ভাই। সে সহ্য করতে পারে না। বলে—ছোড়দা, তুমি কি কোন কথাই আমাদের কানে নেবে না? দেখছ বাবা রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন?

দাদা ছবি বিক্রী করে পয়সা এনে দিচ্ছে? আমি দুটো টিউশ্যনি করে কিছু যোগাড় করছি। তোমার কি ছোড়দা আমাদের জন্যে একটুও কষ্ট হয় না?

ব্রতীন ভ্রুকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—আজকাল তুইও বুঝি বাড়ীর কর্ত্তা হয়েছিস্।

ব্রততী আহত হয়ে চুপ করে যায়। বাবা বলবেন না, মা বলবেন না, দাদা কিছু বলবেন না। তবে বলবে কে? তাই ব্রততী চৈতন্য-হীন ভাইয়ের দুএকবার চেতনা সঞ্চার করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু উত্তর ঐ। ব্রততী আর কথা বলে না। মনে মনে গজরাতে গজরাতে চলে আসে—"ছোটলোকটার সঙ্গে কথা না বললেই ভাল হত?"

তারপরে এই।

সকালে দশটার সময় একটা মেয়েকে বউ সাজিয়ে নিয়ে এসে হাজির করল ব্রতীন। ব্রততী দেখেই ত অবাক! অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—ছোড়দা, এ আবার কে?

ব্রতীন ক্ষুব্ধস্বরে বলল—ভদ্রলোকের মত কথা বলতে জানিস না? এ তোর বৌদি।

—বৌদি!

—হ্যাঁ।

—বিয়ে করলে কবে? বললে না ত!

ব্রতীন বলল—সব জিনিষই কি সব সময় বলা যায়? হঠাৎ হয়ে গেল।

ব্রততী চুপ করে রইল। ভাবতে লাগল। কি আর বলবে? যে মুডে ছোড়দা তার কথা বলছে সে মুডে আর কিছু বলা যায় না। নিজেকে খাওয়ানোর যার ক্ষমতা নেই, সে বিয়ে করেছে, বৌ নিয়ে এসেছে।

ব্রততী চুপ করে থেকে একসময় জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু খাওয়াবে কি ? ঠিক করেছ কিছু ?

—কেন তোরা কি খাস ? তাই খাবে ?

—আমরা খাই ? তুমি কি ছোড়দা জান না আমরা খাই কিনা ?

—ঐ তোরা যা খাস্ তাই খাবে। আমি সব বলেই নিয়ে এসেছি।

ঘোমটার ভেতর থেকে হঠাৎ বউটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—একে এত জমাখরচ দেবার কি দরকার তোমার ? যা বলার হয় বাপ মার কাছে বল।

বাপ মা! বাবা রুগ্ন অবস্থায় ঘরের মেজেতে পড়ে হাঁফাচ্ছেন। আর মা ছেলেপুলেকে খেতে না দিতে পেরে লজ্জায় রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বসে আছেন।

ব্রতীন চেষ্টা করেছিল রান্নাঘরের দরজাটা ফাঁক করে মাকে বৌ দেখাবে। কিন্তু মা দরজা খুলে ভেতর থেকেই ব্রতীনকে অভিসম্পাৎ দিয়েছেন—তুই মর পোড়ার মুখো, তুই মর।

তাই কনেবৌয়ের কথায় ব্রতীন বলল—বলব কাকে ? মা তো রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে মরা কান্না সুরু করে দিয়েছে আর বাবা রোগে পঙ্গু, রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছে।

—তাহলে চল, এখান থেকে চলে যাই। আমি তোমার বোনের কথা শুনতে রাজী নই।

ব্রততী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল। কি নিদারুণ অপমান ? একটা থিয়েটার করা নাচিয়ে মেয়ে তাকে অপমান করছে। আর সে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে ? কর্ণ বিবরটা কি এখনও রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না ? ইন্দ্রিয়গুলো এখনও তীক্ষ্ণ, এখনও সজাগ! উঃ! এই সময় দাদা যদি একবার থাকত! তাহলে সে এর ব্যবস্থা করতে পারত। তার এ অপমানের উচিত সাজা এই থিয়েটার করা মেয়েটা আর

তার স্বামীকে দিয়ে দিত। ব্রততী চুপ করে নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবতে লাগল।

আর বিপরীত মুখী দুটী বিপরীত মানুষ।

বৌটীর মাথায় আর ঘোমটা নেই। থ্যাবড়ান মুখটায় একগাদা স্নো, পাউডার। ঘামের চোটে সেগুলো এমন হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে মুখের ওপর কে যেন এক পরদা কাদা রং মাখিয়ে দিয়েছে।

বৌটী বলল—তবে চল, অন্য কোন জায়গায় যাই। দেখছি ত তোমার বাপ মায়ের অবস্থা ঠিক নেই।

ব্রতীন ইতস্ততঃ করতে লাগল। বলল—আলাদা সংসার। একটা চাকরী বাকরী না করলে……।

বৌটী বলল—চলত এখন। যে পর্য্যন্ত তোমার চাকরী না হয় আমি চালাব।

ব্রতীন আর কোন কথা বলল না। একবার অগ্নিকটাক্ষে বোনের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে পথানুসরণ করল।

দাদাকে সব ঘটনাটা বলল ব্রততী।

সুখেন্দু চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে চলে গেল।

ভেবেছিল সুচরিতাদের বাড়ীর ব্যাপারটা ব্রততীকে বলবে। কিন্তু ব্রতীনের কথা শোনার পর আর তার ইচ্ছা করল না ব্রততীকে কিছু বলে। বরং মনে মনে হঠাৎ সে একটা মতকে পালটে দিল।

পরদিন দুপুরবেলা।

সুখেন্দু বেরুচ্ছিল। ব্রততী এসে বলল—দাদা বেরুচ্ছ?

—হ্যাঁ ব্রত। কেন কিছু বলবি?

—না, কিছু বলব না।

সুখেন্দু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল—বিকেলবেলা ফিরে কিছু যোগাড় করে আনবক্ষণ।

ব্রততী বলল—না দাদা, তোমাকে আর টাকা চেয়ে অপমানিত হতে হবে না বন্ধু-বান্ধবের কাছে। আমি টাকা যোগাড় করেছি। বলছিলাম কি? এই বলে ব্রততী একটু থামল, তারপর বলল—তুমি অনিমেষবাবুর বাড়ী থেকে টাকাটা কবে পাবে?

সুখেন্দু বলল—তাদের বাড়ীতে টাকার কথা ত কিছু বলে নি। তবে মনে হয়, ছবি আঁকা শেষ না হলে দেবে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ব্রততী বলল—ও, আচ্ছা। তুমি ছবিটা শেষ করে এস।

সুখেন্দুর ইচ্ছা করল। সুচরিতার কাণ্ডটা সব বলে ব্রততীকে। কিন্তু বলল না, কারণ ব্রততী এ কথা শুনলে আর কখনই জোর করে পাঠাবে না সুচরিতাদের বাড়ীতে। একশ টাকার মায়া সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যদি বিরাট অন্ধকারের মধ্যে একটু আলোর রশ্মি দেখতে পেয়েছে, এ কথা শুনলে ব্রততী দৃঢ়স্বরে বলবে—না দাদা, তোমাকে যেতে হবে না। মরতে হয় তবুও ভাল। তবু আদর্শচ্যুত হয়ে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই।

ব্রততী আবার বলল—বাবার অসুখটা বড় বেড়েছে, এখন কিছু টাকা না পেলে আর কিছুতে চলছে না। আচ্ছা তুমি যাও, আমি ব্যবস্থা করে নেবক্ষণ!

"এই যে ব্যবস্থা করে নেবক্ষণ" বলল ব্রততী। এই কথাটা যে কত নিদারুণ তা একমাত্র সুখেন্দুই জানে। তবু সে আর ছোট বোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। লজ্জা নয় তবু যদি লজ্জা এসে পড়ে? পাশের বাড়ীর ভাড়াটের ছোট ছেলেটিকে রোজ একটু একটু দেখে ব্রত। ব্রততীর মতই বয়স তার মার। নাম মিনতি। একটু কেন বেশ ভাব ব্রততীর সঙ্গে। এই মিনতির কাছে থেকেই এক এক সময় মান মর্য্যাদা খুইয়ে চরম অবস্থায় পড়লে ব্রততী টাকা ধার নেয়।
দেয় মিনতি। মেয়েটার মনটা সত্যিই ভাল।

বরং ব্রততী অনুযোগ করলে মিনতি বলে—এ কি ভাই ব্রত?

এমন করে বলছ কেন ? আপদে বিপদে দেখা এ ত প্রতি মানুষেরই কর্ত্তব্য।

তবু লজ্জা করে এক এক সময় যখন হাত পেতে টাকাটা নেয় ব্রততী। তাই বুঝতে পেরে মিনতি তার আঁচলে টাকাটা বেঁধে দেয়। বলে—আঁচলটা বাড়ী গিয়ে খুলিস যেন ভাই।

মনটা শুধু মিনতির নয়, মিনতির স্বামী স্বদেশেরও যথেষ্ট ভাল। আর স্বদেশই বার বার বলে দিয়েছিল,—ওগো পার ত ওদের দু চারটে টাকা সাহায্য কর! ওদের অবস্থাটা বড় খারাপ চলেছে।

কোন ব্যাঙ্কের ক্লার্কের পোষ্টে স্বদেশ চাকরী করত। মাইনে অবশ্য খুব বেশী পায় না। তবু চলে যায়। দুটো মানুষ আর একটা বাচ্চা। আড়াইটে। এইতেই স্বদেশের চোখের ঘুম পালিয়েছে। কি করে সংসার চলবে? একদিন একজন ছিল তারপর দুজন হল, তারপর আড়াই। এরপর তিন হবে। তারপর চার, তারপর পাঁচ ......। স্বদেশের মাথা ঘুরতে থাকে। ইস্।

স্বদেশের ভাবনা দেখে মিনতি হাসে, বলে—অত যদি ভাবনা? তবে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে না করলেও পারতে?

স্বদেশ লাফিয়ে ওঠে মিনতির কথায়, বলে—মানে, তিরিশ বছর বয়স হল, এখন যদি না বিয়ে করব তবে করব কবে? আশী হলে ঘাটে ওঠবার সময় করব?

—তবে অত ভাবনার কি আছে? যা হবার তাই হবে। না হয় ডাক্তারের হেলফ নাও।

তাতেও স্বদেশ লাফিয়ে ওঠে, বলে—ও বাব্বাঃ, সে হবে না। ডাক্তারের হেলফ নিয়ে তোমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারব না। ওর চেয়ে সংখ্যা বেড়ে চলুক তবু শান্তি পাব।

মিনতি চুপ করে থাকে। আর মনে মনে হাসে—স্বদেশের ছেলেমানুষী দেখে। অর্থনৈতিক চাপে মনটা ভাঙ্গছে বটে, কিন্তু একেবারে চুরমার হচ্ছে না। এই যা বাঁচোয়া।

তবু কিন্তু স্বদেশ এক সময় ব্রততীকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখে মিনতিকে এসে বলে—মিনু, ওদের বাড়ীর কুমারী মেয়েটা তোমার কাছে এসেছিল বুঝি ?

মিনতি মাথা নাড়ে।

স্বদেশ নিজের মাথাটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বলে—কিছু দিলে নাকি ?

মিনতি বিরক্ত হয়, বলে—আঃ দেব কি ? জান না ঘরে একটা টাকাও নেই, মাস কাবারের শেষ।

স্বদেশ তবু কিন্তু বলতে ছাড়ে না, বলে—আহাঃ ওদের বড় কষ্ট ! বড় ভাইটা এঁকে এঁকেই শেষ হল। বাপ রোগে পঙ্গু।

মিনতি বলে—কিন্তু ওরা ত দান দিলে নেয় না। ধার চেয়ে নেয়, তারপর ফেরৎ দিয়ে দেয়।

স্বদেশ চুপ করে থাকে।

ব্রততী যে ওদের কাছ থেকে টাকা ধার করে আনে মাঝে মাঝে, সুখেন্দু জানে। তাই সুখেন্দু ভাবতে ভাবতে অন্তরের মধ্যে যাতনা অনুভব করতে লাগল। উঃ, এর কি শেষ হবে না ? একটা দরিদ্র পরিবার কি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে ?

অনিমেশ মুখার্জীর বাড়ী। সুখেন্দু এসে ঢুকল।

অনিমেশবাবু সুখেন্দুকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—একি আর্টিষ্ট যে—কি খবর ? হঠাৎ !

সুখেন্দু ম্লান হাসল। তারপর বলল—আমি এসেছি ছবিটা আঁকব বলে।

অনিমেশবাবু হাসলেন, বললেন—বেশ ত ! ইচ্ছে যখন আছে তখন এঁকো। কিন্তু আজ ত হবে না। সুচরিতা বাড়ী নেই। গেছে

একটা পার্টিতে সকালবেলা বর্দ্ধমানে। ফিরবে সেই রাত্রিবেলা। কাল এস। কাল থেকেই সুরু কর।

সুখেন্দু আস্তে আস্তে বলল—আচ্ছা। তাহলে কাল এই বারটায়ই আসব।

অনিমেশবাবু বললেন—আচ্ছা, তাই এস।

সুখেন্দু চলে গেল।

অনিমেশবাবু মনে মনে হাসলেন। কেন হাসলেন সেটা অবশ্য তিনি নিজেও জানেন না, তবে আয়নার দিকে তাকালে তিনি দেখতে পেতেন তাঁর পুরু ঠোঁটের কোণে এক বিজাতীয় ব্যঙ্গ হাসির ঝিলিক।

তার পরদিন বারটা না বাজতেই সুখেন্দু গিয়ে অনিমেশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হল।

সুচরিতা সামনে। হেসে বলল—আসুন সুখেন্দুবাবু! কাল এসেছিলেন ?

সুখেন্দু নিরুত্তরে মাথা নাড়ল।

—আপনি যে আসবেন আমি জানতুম। তাহলে কি ছবি আঁকবেন ?

সুখেন্দু আস্তে আস্তে বলল—সেই মনস্থ করেই ত এসেছি।

সুচরিতা হাসল, তারপর বলল—তাহলে চলুন ওপরেই যাই।

সুচরিতার পেছন পেছন সুখেন্দু এল, সেই ঘর। সেই অজস্র বিভিন্ন ভঙ্গির সমারোহ।

সুচরিতা রঙ, তুলি, ক্যানভাস সব নিয়ে এসে হাজির হল।

সুখেন্দু ক্যানভাসটা ফ্রেমে ভাল করে এঁটে নিয়ে রঙ তুলিগুলো ঠিক করতে লাগল।

সুচরিতা চলে গেল ড্রেসটা পালটাতে। কয়েক মিনিট পরে সে ফিরে এল। এবারের ড্রেসটা একটু অন্য ধরণের।

একটা পাতলা সাদা সিল্কের জর্জেট। এক অভিনব কায়দায় আঁটসাঁট করে পরা। বুকটা বেশ ভাল করেই ঢাকা। সামনে

এসে দাঁড়াল সাধারণ ভাবে। কোন ভঙ্গি নেই, কোন বৈচিত্র্য নেই। সাধারণ একটা আপ-টু-ডেট মেয়ে।

সুখেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল—এ কি এরকম ত সেদিন ছিল না? এ রকম করে ড্রেস করে এলেন কেন?

সুচরিতা মৃদু মৃদু হাসছিল, বলল—কেন বেশ ত হয়েছে? আপনি ত এই রকমই চান। তাই আপনার পছন্দ মত ড্রেস করে এলাম।

সুখেন্দু গম্ভীর হয়ে গেল, বলল—দেখুন সুচরিতা দেবী! ব্যঙ্গ করলে প্রতি মানুষই বুঝতে পারে! আপনি আর যাই করুন, অন্ততঃ ব্যঙ্গ করবেন না। আপনি আগের ড্রেসই করে আসুন। আমি আপনার আগের ড্রেসের ছবি আঁকব বলেই এসেছি—এ ড্রেসের নয়।

সুচরিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। তারপর মনে মনে কি একটা সঙ্কল্প করল। তারপর অস্ফুষ্ট স্বরে বলল—দাঁড়াও, এ লোকটার দম্ভটা একটু ভাঙ্গতে হবে। বড় বেশী দাম্ভিক!

তারপর ও বলল সুখেন্দুকে—বেশ, আপনার কথা মতই আমি আগের ড্রেসই করে আসছি। বলে ও দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুখেন্দু ক্যানভাসটা ঠিক করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর।

সুচরিতা ফিরে এল! কিন্তু ফিরে আসতেই তার দিকে তাকিয়ে সুখেন্দু মুখটা ঘুরিয়ে নিল। সুচরিতার লক্ষ্য এড়াল না। কিন্তু ওর ঠোঁটে মৃদু হাসির ছোঁয়াচ। বলল—দেখুন সুখেন্দুবাবু, এবারের ড্রেসটা ভাল হয়েছে ত!

সুখেন্দু গম্ভীর হয়ে মাথাটা নত করল। তারপর বলল—আপনি যে পোজে দাঁড়াবেন, দাঁড়ান। আঁকাটা শুরু করি। এই বলে সুখেন্দু অন্যদিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

সুচরিতা সবই বুঝতে পারছিল। তাই খুব বিশেষ কথা না বাড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে একটা ডান্সের পোজে নিজেকে ধরে রাখল।

সুখেন্দু পেনসিল দিয়ে ক্যানভাসের বুকে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল।

সাতদিন পরের একটা সন্ধ্যা।

সাপের মত কিলবিলে অন্ধকার চারিদিক কবরিত করে

সুখেন্দু সুচরিতাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পার্ক সার্কাসের মাঠটার কাছে এসে পড়ল। মাথাটা তার ভীষণ যন্ত্রণা করছিল। অসহ্য যন্ত্রণা! যেন রগতুটো ছিঁড়ে খুঁড়ে এখনি মাটীতে আছড়ে পড়বে।

কি অপরিসীম পরিশ্রম! তবু ছবিটা এখনও শেষ করতে পারল না। আর পারবে কি করে, সুচরিতার নাগাল পাওয়াই দুষ্কর। এই সাতদিনে খুব কম সময়ই সে বেলা বারটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত তাকে ধরে রাখতে পেয়েছে। যখনই একটু পোজ নিয়ে দাঁড়িয়েছে, ওমনি দরজায় ধাক্কা।

সুচরিতা তাড়াতাড়ি গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে লাফিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছে।

সামনে প্রবীর রায়।

একটা সৌম্যদর্শন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। আভিজাত্যে ভরপুর চেহারা। চোখে একটা রিমলেশ চশমা। বাটারফ্লাই গোঁফটা একটু নাক দিয়ে বেঁকিয়ে দরজা ছেড়ে ভেতরে ঢোকে। তারপর বলে—হাই জোক, আজও দেখছি সেই একই

কর্ম্মসম্পাদন? দেখি কতদূর হল? বলে প্রবীর রায় এগিয়ে আসে।

সুচরিতা তাড়াতাড়ি তাকে একরকম ঝাপটে ধরে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় সুখেন্দুকে উদ্দেশ্য করে বলে—ডোণ্ট মাইণ্ড আর্টিষ্ট? আজ আমি যাচ্ছি। আজ ম্যাটিনী শো-এ একবার মেট্রোতে যাব। কাল আসবেন। কাল কিন্তু ঠিক অনেকটা এগিয়ে যাব। অনেকক্ষণ কাল থাকব।

সুখেন্দু বলবে কিছু, তার আগেই সুচরিতা প্রবীরকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

শুধু এই একটা দিন নয়। প্রায় সপ্তাহর মধ্যে চারটে দিনই। সুখেন্দু যত তাড়াতাড়ি করে, সুচরিতা ততই দেরী করে দেয়।

রোজ প্রবীর রায় ঠিক দুপুর বেলা এসে উপস্থিত। আজ মেট্রো, কাল পিকনিক, পরশু ডায়মণ্ডহারবার, আজ নীচের রিহার্শাল। নাঃ অসম্ভব। ভেবেছিল সুখেন্দু তাড়াতাড়ি ছবিটা শেষ করে একশটা টাকা নিয়ে ব্রততীর হাতে দিয়ে দেবে! কিন্তু কোথায় একশ টাকা? যে হারে কাজ হচ্ছে বোধ হয় এক মাসেও শেষ হবে না। তবু যে-কটা দিন প্রবীর রায়ের জ্বালাতন থেকে সুখেন্দু সুচরিতাকে বাঁচিয়েছিল, সে-কটা দিন যা অসহনীয় পরিশ্রম করেছে তার তুলনা হয় না। প্রায় অর্ধেকের ওপর কাজ শেষ।

সুচরিতা ত দেখে অবাক! বলল একদিন—ইস্ একেবারে যে শেষ করে আনলেন! আমি ত ভাবলুম অন্ততঃ দু মাসের আগে শেষ হবে না।

মাপা কথা। মাপা হাসি।

সুখেন্দুর একটুও ভাল লাগে না। কি করবে টাকার জন্যেই ত এদের সঙ্গে মেশা। না হলে—।

ব্রততী তবু বলে—দাদা, ওরা যত অপদার্থই হোক ওদের সান্নিধ্যে তোমাকে আসতেই হবে। ওরা অপদার্থ হোক। কিন্তু বর্ত্তমান

জগতে ওদের মূল্য বেশী। ওদের টাকা আছে। ওরা তোমাকে কিনতেও পারে, বেচতেও পারে। সুতরাং তোমার যখন বড় হওয়ার সাধনা। তখন ওদের সান্নিধ্য ছেড় না।

ব্রততীর কথাগুলো সত্যি। মেয়েটা বোঝে বড় বেশী। একেবারে অস্বীকার করতে পারে না বটে। কিন্তু পুরোপুরী স্বীকারও করে নিত না সুখেন্দু; শুধু সংসারের দিকে তাকিয়ে তার সব আদর্শ ভেঙ্গে চুরমার করে শেষ করে দিতে হয়েছে।

টাকা তার চাইই। টাকা না হলে আহার দ্রব্যাদি কেনা যায় না। আর আহার দ্রব্যাদি না হলে উদরও চুপ করে থাকে না। সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। না দিতে পারলে মৃত্যুবরণ। উঃ! আর ভাবা যায় না। এত কষ্টের প্রাণগুলো মৃত্যুমুখে পড়বে ?

চলে যাক্ তবে আদর্শ। যে আদর্শ বাঁচাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয় সে আদর্শের প্রয়োজন নেই।

সুখেন্দু পার্ক সার্কাস মাঠের মধ্যে ঢুকে একটা নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে বসল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। উত্তুরে মেঘ। বোধ হয় বৃষ্টি আসবে। একটু একটু মাথাটায় যন্ত্রণাটা কম ছিল সুখেন্দুর।

তবে কে জয়ী ? সে না অনিমেশ মুখার্জ্জী।

একজন ভেজাল ঔষধের কারবার করে দক্ষিণ কলিকাতায় বাড়ী হাঁকিয়েছে। বিলাস ব্যসনে আরামে—সোসাইটীর উচ্চস্তম্ভে। আর একজন নোংরা ছবি আঁকবে না বলে পণ করে বাপ মা ভাই বোনকে মৃত্যুমুখে এগিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে কে সত্যকার মানুষ ? অনিমেশ মুখার্জ্জী না সে ? সাধু দরিদ্র আর্টিষ্ট না ভেজাল ওষুধের কারবারী বড়লোক ডাক্তার ?

একদিন সন্ধ্যেবেলা আঁকা শেষ করে সুখেন্দু নামছে।

পাশে ড্রয়িংরুম।

ড্রয়িংরুম থেকে উত্তেজিত গলা। কে একজন শেঠজী চীৎকার

করে ডাক্তারকে বলছে—এ কি জুলুম কা বাত বাবুজী? আমি বলছি এত সস্তায় মাল বিকাব না। তবু আপনি জুলুম কোরছেন।

সুখেন্দুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বিস্ময়। ডাক্তারের কাছে শেঠজী? আশ্চর্য্য ত!

আবার বলছে মাল বিকাব না।

কি এমন মাল? যার জন্যে ডাক্তার তাকে অনুরোধ করছে?

সুখেন্দু ডাক্তারের গলা শুনতে পেল—দেখ, এতকাল তুমি আমাকে এই ভেজাল ওষুধ দিয়ে আসছ, কোনদিন কোন ওজর আপত্তি করনি। আজই বা তোমার কি এমন হল? যার জন্যে এমন করছ? ডাক্তার মৈত্র তোমাকে যে দাম দেন আমি ত বলছি সেই দাম দেব। তবে কেন এ রকম করছ?

শেঠজীর গলা শোনা গেল—না বাবুজী, তা আর হবে না। আমি আপনাকে সে দামেও কুচ্ছু দিতে পারব না। আপনি আমার ওষুধ নিয়ে এই সোব ধোন দৌলত করেছেন। আর এতো কাল আমাকে ফাঁকী দিয়ে এসেছেন। আপনার সোব ফাঁকী ধরা পোড়ে গেছে। তোখন আমাকে এর দস্তুর কুচ্ছু দিতে হোবে। তোবে আমি আবার মাল দিবো।

অনিমেশবাবুর অনুনয়—বেশ, এই যদি তোমার শেষ কথা হয়। তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। তবে আমার কথা যদি না শোন, তাহলে তোমাকে এবার বিপদে পড়তে হবে—জেনে রেখ।

শেঠজীর হাসি। বলল—বাবুজী আমাকে ডর লাগিয়ে দিচ্ছেন? পুলিশের কাছে যদি কুচছু বলেন তাহলে আপনিও কি বাঁচতে পারবেন? ভেজাল ইনজেকসন ফুঁড়ে কত রুগীর প্রাণ নিয়েছেন যোখন পুলিশ জানতে পারবে, তোখন যে আপনার............!

সুখেন্দু শিউরে উঠল। নাঃ, আর শোনা যায় না। এ যে কানে

ঢুকলেও পাপ। উঃ, এই রকম মানুষকে হত্যা করে অর্থ উপায়! এদের কি মানুষ কোন উপায়েই সাজা দিতে পারে না?

সুখেন্দু আর দাঁড়াল না। এক দণ্ডও আর এখানে থাকা যায় না। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। কি বিষাক্ত আবহাওয়া, ঐ অত বড় বাড়ী। ঐ বাড়ীর প্রতিটী ইট তবে পাপের অর্থে তৈরী? প্রতিটী রুগীর শোণিত ধারায় গড়ে উঠেছে তিনতলা সমান ইমারত!

সেদিন সারারাত সুখেন্দু ঘুমতে পারেনি, শুধু ঐ চিন্তায়। কেবলই তন্দ্রা এলে মনে পড়েছে অনিমেশ মুখার্জ্জীর মুখটা। মনে পড়েছে একটা কল্পিত ছবি। ডাঃ অনিমেশ মুখার্জ্জী যখন যন্ত্রণাক্লিষ্ট রুগীকে ভেজাল ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। আর তার পরিবর্ত্তে মুঠো মুঠো টাকা পকেটস্থ করছেন! আর সেই টাকায়—সুচরিতার ভালের ব্যয়। তার বিলাস-ব্যসনের ব্যয়। বাড়ীর ভাঁট বজায়।

আচ্ছা এ বিষয়ে কি সুচরিতা কিছুই জানে না?

জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়?

পরদিন সুখেন্দু এসে সুচরিতাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্য দুচার বার চেষ্টা করল।

কিন্তু হঠাৎ একটা কথা ভেবে থেমে গেল। যদি অন্য উৎপত্তি হয়? যদি জিজ্ঞাসা করে ফ্যাসাদে পড়ে? এ কথা জানতে পেরেছে সুখেন্দু। জানলে যদি অনিমেশ মুখার্জ্জী তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ফন্দি করেন?

আর সুচরিতাকে যদি বলতে নিষেধ করে। তাতেও কি সুচরিতা শুনবে? ও একটা অন্য ধরণের মেয়ে। মায়া মমতা বড় কম। বড্ড উগ্র। যেন মাটীতে পা-ই ফেলতে চায় না।

কেবল ব্যঙ্গ! সুখেন্দু আর্টিষ্ট হয়ে যেন অপরাধ করেছে। গরীব হয়ে যেন অন্যায় করেছে। এমন করে ব্যঙ্গ করবে যে মনে হয় গালে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে দিই।

শুধু ঐ একশ টাকার মায়া। না হলে—কিছুতেই সুখেন্দু এখানে আসত না। আঁকত না সুচরিতার বিশ্রী ঢঙের ছবি? শুনত না ব্রততীর কোন অনুরোধ? যা হয় হোক্। এতে যদি তার প্রতিভার প্রকাশ না হয়। ক্ষতি নেই।

শুধু ঐ একশটা টাকা। আবার একশ টাকা নয়। আরও কিছু। একশ টাকার ওপরে আরও কিছু। ব্রততী বলে—দেখবে ওরাই ঈর্ষান্বিত হয়ে তোমার ছবি নিয়ে পরস্পরে মারপিট সুরু করে দেবে? যদি একজন আঁকায় একটা ছবি। আর একজন ঈর্ষান্বিত হয়ে দুশ টাকা দিয়ে আর একখানা ছবি আঁকাবে! তারপর আর একজন, তারপর আর একজন। মাঝখান দিয়ে তোমার হবে প্রশংসা আর টাকা। ওরা শুধু রেষারেষি করেই মরবে।

কিন্তু তবু আর সহ্য হয় না?

এই কদিন এদের সান্নিধ্যে এসে, এদের কীর্ত্তিকলাপ দেখে সুখেন্দুর শিল্পীমন এতটুকু তুলি যেন আর চলতেই চায় না। কেবলই মনে পড়ে যায় ডাক্তার অনিমেশ মুখার্জ্জীর কথা। ভেজাল ওষুধ। যে বাড়ীতে বসে সে দিনের পর দিন ছবি এঁকে চলেছে সে বাড়ী মানুষ হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত। এমন কি এক কাপ চা পর্যন্ত আর সুখেন্দুর গলা দিয়ে সহজে নামে না।

তবু যেতে হয়, এই যা দুঃখ।

পার্ক সার্কাস মাঠের ঘাসের গালিচার ওপর বসে সুখেন্দু ভাবছিল। চোখের সামনে একটা জোরাল লাইটের আলো। অন্য সময় হলে সুখেন্দু লাইটের সামনে থেকে সরে যেত। কিন্তু আজ তার চোখের সামনের দিকে তাকাবার এতটুকু অবসর ছিল না। চোখ তার আজ অন্ধকার মনের মধ্যে। যেখানে এতটুকু আলোর চিহ্ন মাত্র নেই।

এই সাত দিনে কত অভিজ্ঞতা।

পটে আঁকা ছবি

যেন একটা মহাভারত।

ব্রততী কাজ পেয়েছে। কাজটা অদ্ভুত। একটা কারখানায় আলু ছাড়াবার কাজ। কে নাকি সুবলের মা তিনি এই কাজটা ব্রততীকে করে দিয়েছেন। সিদ্ধ আলু। যত ছাড়াবে তত পয়সা। ফুরণে কাজ আর কি? মাইনে পত্তর কিছু দেয় না। মণ পিছু হু'টাকা। তবে একদিনে এক মণ হয় না। সুখেন্দু ব্রততীকে জিজ্ঞাসা করেছিল। ব্রততী বলে—না দাদা, আমি চেষ্টা করেছি কিছুতে এক মণ করতে পারি না। তিরিশ সেরের বেশী কিছুতে হয় না। তাই তিরিশ সের করলে কম মেহনত হয়! হাত পা একেবারে টন টন করে। বাড়ীতে এসে আর বসতে পারে না ব্রততী। লম্বা হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে। তারপর একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে দেহটা সুস্থ করে তবে ওঠে।

ব্রততী বলে—দাদা, তোমাকে নিষেধ করেছি যা, তা কিন্তু শুনবে —বুঝলে? তোমার ওপর আমার অনেক আশা ভরসা। মানুষের মত মানুষ হয়ে না উঠতে পারলে মানুষ কি? নিজেকে স্থির রেখে সাধনা কর। সফলতা লাভ করবেই। আমি ত কাজ পেয়েছি, টিউশ্যনি করছি। আর ভাবনা কি?

ব্রততীর কথা শুনে সুখেন্দু রেগে যায়! বলে—হ্যাঁ, বেশ কথা বললি যা হোক। তুই দিন রাত খাট। আর আমি গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াই। আমার বুঝি কোন মনুষ্যত্ব নেই!

দাদার অভিমানে ব্রততী হাসে। বলে—তা কেন। পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছে তাদের মনুষ্যত্ব কি খুব ছোট ছিল? তাই তোমার মনুষ্যত্বও কেন ছোট হতে যাবে? তুমি সাধনা করে বড় হও। তখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। এখন না হয় আমার ওপর নির্ভর করলে?

সুখেন্দুর চোখে জল এসে পড়ে। সামলে নিয়ে বোনের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। দেখে সে মুখে সুন্দর স্নেহশীলা

ভগ্নীর একটি প্রতিচ্ছায়া। সুখেন্দু হেসে বলে—তুই আমাকে খুব ভালবাসিস না রে ব্রত?

ব্রততী ম্লান হাসে। সেও দাদার কল্পাবিক্ষুব্ধ মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—তুমি ত জান, কেন আমি এত আঁকুপাঁকু করে মরি? ভালবাসি শুধু তোমাকে নয় তোমার সৃষ্টিকেও। তুমি ধ্বংস হয়ে গেলে অবশ্য আমার দুঃখ হবে। দাদা হারাব। সে অবশ্য আমার একার ক্ষতি হবে। কিন্তু তোমার সৃষ্টি মরে গেলে লক্ষ লক্ষ লোক বঞ্চিত হবে জানো দাদা? সেইজন্যে তোমাকে এত করে সাবধান করি।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় সুখেন্দুর। পকেটে দুখানা ডান্স দেখার ফ্রি পাশ। আজ সুচরিতা তার হাতে গছিয়ে দিয়েছে। সুখেন্দু চায়নি, সুচরিতাই গছিয়ে দিয়েছে। বলেছে—এ দুখানা নিয়ে যান সুখেন্দুবাবু। আমার ত ডান্স আপনি দেখেন নি? কাল নিউ এম্পায়ারে শো। আসবেন।

নিত না সুখেন্দু, ফেরৎ দিত। ডান্স দেখার সখ তার নেই। ঐ ধেড়ে ধেড়ে মেয়েগুলো বুক চিতিয়ে কোমর বেঁকিয়ে হাজার লোককে মোহিত করবে—আর তাই দেখতে হবে! সুখেন্দুর লজ্জা করে। ও দেখত না। ব্রততীর কথা ভেবেই কার্ড দুখানা নিয়েছে। ব্রততী খুসী হবে। ও অনেকদিন বলেছে সুচরিতা দেবী অনেক ডান্স দেন। একদিন দুখানা পাশ নিয়ে এস না!

ব্রততীর কথাটা মনে পড়ে যেতে সুখেন্দু নিয়েছে। কাল আর সুচরিতাদের বাড়ী যেতে হবে না। সুচরিতা কাল থাকবে না। সারাদিন ষ্টেজে। বিকেলে ছটায় ডান্স। সুখেন্দুকে যেতে বলেছে সুচরিতা সাড়ে পাঁচটার সময় হলে।

সুখেন্দু পকেট থেকে কার্ড দুটো বের করে একবার দেখল। গোলাপী রংয়ের সুন্দর দুটো কার্ড। ওপরে একটি মেয়ের মূর্ত্তি।

হাত জোড় করে ভক্তের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে আছে। তার নীচে রূপালী কালিতে ইংরেজীতে লেখা—কারেন্ট এ্যাট্রাকসন্—ডান্স অফ সুচরিতা মুখার্জী।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কার্ড দুটো দেখে সুখেন্দু পকেটে রাখল। তারপর গালিচার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ী যাবার পথ ধরল।

তার পরদিন।

সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচটা।

সুচরিতা বলে দিয়েছিল—গ্রীণরুমে দেখা করে যাবেন।

সুখেন্দু ভাবল—ব্রততীকে সঙ্গে করে গ্রীনরুমে যায়। কিন্তু ভাবল—না, ওরা সোসাইটি গার্ল। হয়ত কি বলতে কি বলবে। আবার অভিমানী মেয়ে ব্রততী। সেন্টিমেণ্টাল হার্ট। হঠাৎ আঘাত পেতে পারে। তাই ওকে নির্দ্দিষ্ট সীটে বসিয়ে সুখেন্দু গ্রীণরুমে চলে এল।

গ্রীণরুমের দরজার কাছে গিয়ে সুচরিতার নাম বলতে দ্বাররক্ষী একবার ওর দিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল। পোষাক আজ সুখেন্দুর ভালই ছিল। ছেঁড়া অন্ততঃ ফর্সা। তবু যেন দ্বাররক্ষী নাকটা সিঁটকাল। বলল—এখন দেখা হবে না। সুচরিতা দেবী এখন খুব ব্যস্ত। তিনি পেণ্ট করছেন।

দ্বাররক্ষীর কথা শুনে সুখেন্দুর চোয়ালটা একটু শক্ত হয়ে উঠল। বলল—বল গিয়ে আর্টিষ্ট এসেছেন!

দ্বাররক্ষীটা একটু ঘাবড়ে গেল। আর্টিষ্ট? জিজ্ঞাসা করল সুখেন্দুকে—কোন আর্টিষ্ট? আপনি কি এ শোয় প্লে করবেন?

সুখেন্দু আগেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই একটু ক্ষুব্ধস্বরে

বলল—অত জানতে হবে না! সুচরিতা দেবীকে গিয়ে বললেই তিনি বুঝতে পারবেন!

দ্বাররক্ষী কি একটু ভেবে বলল—আচ্ছা, অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি।

কিছুক্ষণ পর। দ্বাররক্ষী ফিরে এল সাথে একটী মেয়ে।

মেয়েটী সুখেন্দুর কাছে এসে বলল—নমস্কার। আমাকে সুচরিতা পাঠিয়ে দিল। ও এখন পেণ্টরুমে কিনা?

—ও। আচ্ছা। তাকে বলে দেবেন আমি এসেছিলাম।

মেয়েটী তাড়াতাড়ি বলল—না-না আপনাকে যেতে বলেন নি। আমার সঙ্গে ভেতরে যেতে বলেছেন। আমি ওর বন্ধু। নাম—অমিতা, অমিতা সেন। আপনার আঁকা ছবি সুচরিতাদের বাড়ীতে দেখে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যগ্র ছিলাম। ভেতরে আসুন। সুচরিতা সেখানেই আছে।

সুখেন্দু তাকিয়ে দেখল, অমিতা সেনের দিকে। মেয়েটী সুচরিতারই দ্বিতীয় সংস্করণ। তবে সুচরিতার মত অত উগ্র নয় এই যা। বেশ মিষ্টি কথাগুলো। শুনলে গা-টা জ্বালা করে না। তবে দর্শন সেই সুচরিতারই মত! অত্যাধিক বাজে জায়গায় বেশী রঙ খরচ করে নিজের আসল সৌন্দর্য্যকে ঢেকে ফেলেছে।

যাই হক সুখেন্দু অমিতার অনুসরণ করল। অমিতা যেতে যেতে বলল—গুণী মানুষদের সঙ্গে আলাপ করতে পেলে সাধারণ মানুষরা এত খুসী হয় কেন বলতে পারেন?

সুখেন্দু অমিতার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

অমিতা আবার বলল—এই যেদিন আপনার আঁকা ছবিটা সুচরিতাদের বাড়ীতে দেখেছি, সেদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে মনটা আমার উদগ্রীব হয়েছিল!

অমিতা একটা ঘরের সামনে এসে থামল। ঘরের দরজায় একটা দামী পর্দ্দা দেওয়া।

পর্দার ভেতর থেকে অনেকগুলি কণ্ঠের হাসির রোল পর্দায় এসে ধাক্কা মারছিল।

অমিতা দাঁড়ান বলে পর্দা সরিয়ে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরে পর্দা সরিয়ে হাত নেড়ে সুখেন্দুকে ডাকল।

সুখেন্দু ভেতরে প্রবেশ করল।

ছোট্ট একটা কাঠের ঘর। ওপাশে একটা বড় আয়না। তার সামনে সুচরিতা বসে পেন্ট করছে। আয়না দিয়ে দেখা যায় কেউ ঢুকলে দরজা দিয়ে। ঘরে আরও অনেকগুলি লোক। একটা সরু বেঞ্চির ওপর তারা বসে। প্রত্যেকটী লোকের দিকে একবার আড়নয়নে সুখেন্দু দেখে নিল। সব কজনাই অভিজাত বংশের; অন্ততঃ পোষাকে। সব কজনাই অল্পবয়স্ক যুবক। ওরা খুব হাসির তুফান তুলে আলাপ করছিল। সুখেন্দু ঘরে ঢুকতেই কানে গেল একটা কথা—কে একজন বলছে—দেশকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা—দেশ আমাদের নিয়ে যাচ্ছে না।

তাই ঘরে ঢুকেই বক্তাকে একবার দেখবার লোভ সুখেন্দু ছাড়তে পারল না। এই পরিবেশে যে এমন কথা বলছে সে ব্যক্তিটী কে? কিন্তু বুঝতে পারল না কে এ কথাটী বলেছে। তার আগেই সুচরিতা আহ্বান জানাল—আসুন সুখেন্দুবাবু!

সুচরিতা উঠল না। আয়নার ভেতর দিয়েই সুখেন্দুর দিকে চাইল। সুচরিতা তুলি দিয়ে নিজের ভুরুদুটো আঁকছিল। আঁকা শেষ করে আয়নার সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল।

সুখেন্দুর সামনে এসে হেসে বলল—কতক্ষণ এলেন? আমি ভাবলুম বুঝি আর এলেন না! আপনার ত আবার এ সব সহ্য হয় না।

সুখেন্দু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বেঞ্চিতে যে কয়জন বসেছিল, তারা একটু অবাক হয়েই সুখেন্দুর দিকে তাকিয়েছিল। শুধু একজন যে প্রবীর রায়, সেই

একটু অন্যমনস্ক। বাকী কজনা ভাবছিল—সুচরিতার সঙ্গে সাধারণ এই লোকটার সম্বন্ধ কি? সামনে এত যখন সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশের যুবকেরা রয়েছে!

সুচরিতার পাশে অমিতা দাঁড়িয়ে।

অমিতা বলল—আমার সঙ্গে কিন্তু সুখেন্দুবাবুর আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজেই পরিচয় করে নিয়েছি।

সুচরিতা ওর কথা শুনে হাসল, বলল—তা জানি! তুই কি আর কারও জন্যে অপেক্ষা রাখিস্? তারপর ও ফিরে সেই সরু বেঞ্চির যুবকগুলোর দিকে লক্ষ্য করে বলল—এঁকে তোমরা চেন?

সুনীল বোস একজনের নাম। সে বলল—চিনব মানে? আমরা কি আজকাল গায়ে সাইন বোর্ড লাগিয়ে ঘুরে বেড়াই যে দেখলেই চেনা হয়ে যাবে?

সুচরিতার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু লজ্জিত হল না। শুধু হাসল একটু। বলল—কবিতা লেখ বলে কি সব জায়গায়ই কবিতার ভাব ফোটাবে?

তারপর সুচরিতা সুখেন্দুকে বলল—এনার নাম সুনীল বোস। ব্যারিষ্টার বসুর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? বর্ত্তমানকালে যিনি সবচেয়ে বড় ব্যারিষ্টার। সেই ব্যারিষ্টার বসুর একমাত্র সন্তান। এম, এ পাশ করেছেন। এখন বিলাত যাবার জন্যে তোড়জোড় করছেন। এবং এনার আর একটী গুণ আছে সেটা হচ্ছে দুর্ব্বোধ্য কবিতা লেখা। যেখানে সেখানে যখন তখন খাতা আর কলম নিয়ে বসে যান। আর ঘরের সঙ্গে দুধের স্বরের মিল নিয়ে কবিতা রচনা করেন। বলে সুচরিতা একটু হাসল।

আর পাশে ইনি। ইনি হচ্ছেন পণ্ডিত দেবেশ শাস্ত্রী জ্যোতিষ বাচস্পতির নাম শুনেছেন নিশ্চয়। তাঁরই একমাত্র নাতি এবং দাদুর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। করেন না উপস্থিত কিছু। তবে ভবিষ্যতে ব্যবসা করবার মনস্থ নিয়ে চলছেন। নাম পৃথ্বিশ।

আর ইনি। সুবীর অধিকারী। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের ভাইপো। বিরাট বড়লোক।

আর ইনি। সতীনাথ গোস্বামী। কিছুকাল এআর ফোর্সে চাকরী করে একখানা হাত জখম করে ফিরে এসেছেন। এখন বসে আছেন। পরে কি করবেন ভাবছেন।

আর ইনি। প্রবীর রায়। এনাকে ত চেনেনই।

আর ইনি শেখর মিত্র। বাংলা ভাষায় ইনি একজন বেশ পণ্ডিত মানুষ। আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করে আমাকে যথেষ্ট সুখী করেছেন।

আর ইনি। এনার সঙ্গে ত আগেই পরিচয় হয়ে গেছে। নাম অমিতা সেন। বাংলায় এম, এ। একটী বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিষ্ট্রেস। আমার বন্ধু। আপনার ছবি দেখে যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। এবং আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

সুখেন্দু সবাইকে হাত তুলে নমস্কার জানাল।

আর ইনি। সুচরিতা সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল—ইনি একজন আর্টিষ্ট। ভাল ছবি এঁকে কয়েকটা একজিবিশন থেকে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছেন। ইদানীং আমার একটী ডান্সের ছবি আঁকছেন। প্রবীর সে ছবিটা দেখেছে। ছবিটা আঁকা হলে আমি লণ্ডনের একটা একজিবিশনের জন্যে পাঠিয়ে দেব।

পরিচয় শেষ হল।

প্রবীর তাড়া দিল—কই তাড়াতাড়ি পেণ্ট শেষ করে নাও। সময় ত হয়ে গেল। সুচরিতা প্রবীরের কথার উত্তর না দিয়ে অমিতাকে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল—কেমন দেখছিস্ সুখেন্দুবাবুকে? আমি যা বলেছিলাম তার সঙ্গে মিলছে ত?

অমিতা হাসল। উত্তর দিল না।

সুচরিতা সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল—

আমার ডান্স দেখতে এসেছেন! নাক সিটকোবেন না যেন? অডিটোরিয়েমের দর্শক দেখেছেন ত? ঐ অত দর্শক আমার ফ্যান। আপনি কিছু বললে কিন্তু ওরা আপনাকে আর সুস্থদেহে বাড়ী ফিরতে দেবে না! আর এই যে সব আমার বন্ধুবান্ধবরা দেখছেন এরাও আমার বিশেষ ভক্ত।

হঠাৎ সুনীল বোস অবাক হয়ে বলল—বল কি সুচরিতা? ইনি তোমার ডান্সের নিন্দা করেন?

সুচরিতা হাসল, বলল—না আমার ডান্সের নিন্দা করেন না! আমার পোষাকের নিন্দা করেন। তোমরা আমার যে ঢঙের পোষাক পরা পছন্দ কর ইনি সেটা বরদাস্ত করতে পারেন না। ইনি সেই আগের যুগের মত কিনা!

অমিতার এই ধরণের আলাপ আলোচনা ভাল লাগছিল না। একটা ভদ্রলোককে ডেকে এনে অপমান নীতিবিরুদ্ধ। তাই সে বলল—কারুর রুচিবোধ নিয়ে সমালোচনা করা কারুরই উচিত নয়। আমি সুখেন্দুবাবুকে নিয়ে অডিটোরিয়ামে যাচ্ছি। শো শেষ হলে আসব।

সুচরিতা একটু আহত হল অমিতার কথায়। কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ নিজেকে সংযত করে বলল—যাক্‌গে। তুই সুখেন্দুবাবুকে নিয়েই যা, শো শেষ হলে আসিস্। তারপর সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে সুচরিতা বলল—আপনি কি একা এসেছেন সুখেন্দু-বাবু? না, সঙ্গে কেউ আছেন?

সুখেন্দু একটু ইতস্ততঃ করে বলল—না একা নয়। সঙ্গে আমার বোন আছে?

—বারে। আচ্ছা ত লোক আপনি? বোনকে এনেছেন আলাপ করিয়ে দিলেন না? দেখতুম আর্টিষ্ট ভাইয়ের বোনটী কেমন? যাই হোক শো ভাঙ্গলে কিন্তু আসবেন। বোনের সঙ্গে আলাপ করব।

সুখেন্দু একটু ইতস্তত: করে বলল—তার সঙ্গে আলাপ করে কি কিছু সুবিধা হবে?

সুচরিতা বিস্মিত হয়ে বলল—কেন? তিনি কি আলাপ করতে পারেন না? না—ভায়ের গর্ব্বে গর্ব্বিতা বলে আমাদের সঙ্গে আলাপ করবেন না?

অমিতা আবার বাধা দিল—আঃ তোর কথাবার্ত্তাগুলো কি ঠিক করবি না? তিনি যদি আলাপ না করতে চান তবু তুই জোর করে আলাপ করবি?

এবার সুচরিতা একটু রেগে উঠল। বলল—তোর দেখছি বড় বেশী দরদ সুরু হয়ে গেছে? উত্তরটা সুখেন্দুবাবুর কাছ থেকেই আশা করছিলাম তোর কাছ থেকে নয়।

অমিতা চুপ করে রইল।

সুচরিতা বলল—তাহলে যান সুখেন্দুবাবু। বোন না আসুক, একবার আপনি না হয় আসবেন! তারপর সুচরিতা একটু চাপাস্বরে অমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হেসে বলল—দেখিস্ একটু সামলে।

সুখেন্দু আর অমিতা পর্দার বাইরে আসতেই দুজনকার কানেই গেল। সুচরিতার একটা কথা—দুটোই ইডিয়ট।

অমিতা একবার সুখেন্দুর দিকে তাকাল। সুখেন্দুও একবার অমিতার দিকে তাকাল।

শো ভাঙ্গল।

লোকেরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। সুখেন্দুকে দেখা গেল লোক কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে।

খানিকটা ভেতরে ঢুকতেই অমিতা আর ব্রততীর সঙ্গে দেখা।

অমিতা সুখেন্দুকে দেখে বলল—আচ্ছাই লোক আপনি? সেই আসছি বলে চলে গেলেন আর এই এলেন?

সুখেন্দু হাসল, বলল—কি করব বলুন? একটু অসুবিধা ফিল করছিলাম তাই বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

অমিতা বলল—ও বুঝেছি। সুচরিতা যা বলেছিল তাই ঠিক। আপনি এসব আধুনিক দৃশ্য পছন্দ করেন না—না?

সুখেন্দু হাসল, বলল—পছন্দ ঠিক করি না বললে ভুল হবে। চোখে যেন কেমন লাগে। কিছুতে সহ্য করতে পারি না।

অমিতা বলল—তাহলে আপনি ছবি আঁকেন কেমন করে? শুনেছি আপনারা ত ছবি আঁকার জন্যে মেয়েদের মডেল করে সামনে বসিয়ে রাখেন!

—শুনেছেন কথাটা অবশ্য ঠিকই। তবে আমি করি না। আমি মৃত বস্তুকে জীবন্ত করবার জন্যে ছবি আঁকি। জীবন্ত কোন কিছুকে মৃতের রূপ দিই না। আপনাদের সুচরিতা দেবীর ছবি আমি আঁকতাম না। যদি না—। সুখেন্দু থামল।

অমিতা জিজ্ঞসা করল—যদি না—তারপর!

সুখেন্দু ম্লান হাসল, বলল—তারপরেরটা সেই প্রশ্ন। টাকা!

অমিতা চুপ করে রইল।

তারপর অমিতা কথা বলল—সত্যি আমি বড় আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি সুখেন্দু বাবু? এতকাল শুনে আসছি আর্টিষ্টেরা জীবন্ত বস্তুর ছবি এঁকে ছবিকে আরও জীবন্ত করে তোলে। কিন্তু আপনার কাছে শুনলাম জীবন্ত বস্তু অঙ্কনে মৃতের রূপ পায়। আশ্চর্য্য! সত্যি আমি বুঝতে পারলাম না সুখেন্দুবাবু।

সুখেন্দু হাসল, হেসে ব্রততীর দিকে চেয়ে বলল—ব্রত একদিন অমিতা দেবীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিস্ ত! উনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন আমার কথা শুনে!

ব্রততী হাসল, বলল—তোমার কথা শুনলে সবারই একটু

অবাক ভাব লাগে দাদা! আমার চেয়ে তোমার বোঝানতেই ভাল হবে তুমিই বুঝিও।

সুখেন্দু হাসল, বলল—আচ্ছা যা হোক্—আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম তোর ফাঁদে ফেলে দিয়ে আর তুই……।

ব্রততী বলল—বারে, তুমি ত বেশ!

অমিতা ভাই বোনের আলাপ শুনে হাসল। হেসে বলল—বাঃ আপনারা ত দেখছি বেশ! দুজনে পথের ওপর কথা কাটাকাটি করতে সুরু করে দিয়েছেন।

ব্রততী একটু অভিমানজড়িত স্বরে বলল—দেখুন না অমিতাদি। দাদা সর্ব্বদা নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে বিপদে ফেলে।

অমিতা হাসতে হাসতে বলল—তাই যদি সত্যি হবে! তবে হলের মধ্যে অত দাদার প্রশংসা করছিলে কেন? তুমি ও ত দেখছি দাদার প্রেমে একেবারে মুহ্যমান!

ব্রততী মুখটা গোমড়া করে বলল—ছাই, প্রেম না আর কিছু! অবাধ্য দাদা বলেই তাই খোঁজ খোঁজ করি।

অমিতা হাসল, বলল—সত্যি আরও অদ্ভূত লাগছে ব্রত। তোমাদের ভাই বোনের ভালবাসা দেখে। এ যুগে এতখানি সত্য বিরল। মানুষ আজকে ভালবাসতে জানে? হৃদয়ের যে সুর সে সুর ত অনেকদিনই জানতাম হারিয়েছে পথ! কিন্তু তোমাদের দেখে—।

সুখেন্দু বলল—আপনি বাংলায় এম, এ—না!

অমিতা লজ্জিত হয়ে বক্তৃতা থামাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—একটা অনুরোধ করব সুখেন্দুবাবু? আমার মৃত মায়ের একটা ফটো আছে। সেই ফটোটা দেখে আমাকে একটা বড় ছবি এঁকে দেবেন? পারিশ্রমিক অবশ্য খুব বিশেষ দিতে পারব না। গরীব মানুষ। স্কুলের মাষ্টারী করে কোন রকমে সাত আটটী ভাই-বোনকে নিয়ে চালাই। তবু একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে ত কিছু করা যায় না তাই পঁচিশটা টাকা আমি দিতে পারি।

সুখেন্দু বলল—আচ্ছা সেটা ত এক্ষুণি কিছু হচ্ছে না। আলাপ যখন হয়েছে তখন একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবেক্ষণ। এখন একটু চলুন ত! ওদিকে সুচরিতাদেবী হয়ত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সুচরিতার কথা শুনে অমিতা দাঁত দিয়ে অধরটা একটু চেপে ধরে বলল—ওখানে না গেলে কি সত্যই হয় না সুখেন্দুবাবু?

সুখেন্দু বলল—না অমিতা দেবী, কথা দিয়েছি। কথা না রাখা শোভনীয় নয়।

অমিতা বলল—কিন্তু আমার মনে হয় ওখানে না গেলেই ভাল হত। বিশেষ করে ব্রততীকে নিয়ে। ও সব দাম্ভিকা মেয়ের সংস্পর্শে যত কম আসা যায় ততই ভাল।

সুখেন্দু হাসল, বলল—বন্ধুর অপমান করছেন?

—অপমান? অমিতা ম্লান হাসল। মান যার বার বার কেড়ে নেয় সে যদি—একবার আড়ালে অপমান করে—তাতে ক্ষতি কি?

সুখেন্দু একটু চুপ করে গেল। তারপর ব্যথিত স্বরে বলল—কিছু যদি মনে না করেন? আপনার সঙ্গে আলাপ হল কেমন করে?

অমিতা বলল—এই এইরকম এক গ্রীণরুমে। ড্যান্সটা ভাল লেগেছিল বলে কনগ্রাচুলেশন ফ্লাওয়ার দিতে গিয়েছিলাম। আলাপ হয়ে গেল। বাড়ীতে নিয়ে গেল। তারপর ঘনিষ্ঠতা। এই ক মাস ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে যথেষ্ট মান মর্য্যাদা হারিয়েছি। যদি বলেন আসেন কেন? তার ও হয়ত উত্তর দিতে পারব না! কারণ আসি যে কেন সেই জানি না। কি যেন একটা আকর্ষণ। নিজেও জানি না সুতরাং বলতেও পারব না। অমিতা ম্লান হাসল।

সুখেন্দু বলল—যাক্‌গে তবু চলুন একবার দেখা করে আসি।

—বেশ চলুন।

চলতে চলতে অমিতা একটু চাপাস্বরে সুখেন্দুকে বলল—একটা কথা কিন্তু। ওকে কিন্তু আপনি কক্ষনও বলবেন না আপনি ড্যান্স দেখেন নি।

সুখেন্দু বলল—মিথ্যে কথা বলব ?

অমিতা চুপ করে থেকে একটু বলল—বেশ আপনি কিছু বলবেন না। যা বলার হয় আমি বলবক্ষণ।

গ্রীনরুম।

সুচরিতা বসে রয়েছে ফুলের পাহাড়ের মধ্যে। পাশাপাশি সেই আগের বন্ধু-বান্ধবের দল। প্রবীর রায়, সুনীল বোস, পৃথ্বীশ, সুবীর অধিকারী, সতীনাথ গোস্বামী, শেখর মিত্র। নতুন ও কয়েকটা জুটেছে।

প্রবীরকেই বেশী কথা বলতে দেখা যাচ্ছে—উঃ সুচরিতা। তুমি যে আজ কি ড্যান্স দেখালে ? আমার ফাদার ও বোধহয় কোনদিন এরকম ড্যান্স দেখেন নি।

সুনীল বোস ঃ সুচরিতা আজ ওয়াণ্ডার ফুল। আই হ্যাভ নেভার সিন ইন মাই লাইফ। আমি যখন অডিটোরিয়ামে বসে দেখছিলাম, মনে হচ্ছিল স্বর্গের মেনকা বুঝি আজ আমাদের এই কলকাতার ষ্টেজে—

আমি যে দেখিনু রাতের আকাশে'
দুটী চোখে সেই স্বপ্ন,
তুমি কি বোঝ না হৃদয় সমীরে
কার কথা নিয়ে—

ইস্। মিলটা যে আর হচ্ছে না। সুনীল মাথা চুলকোতে লাগল।

সুনীলের রকম দেখে সবাই হেসে উঠল। সুচরিতা হাসতে হাসতে বলল—তুমি দেখছি সুনীল একেবারে ওয়ার্থলেশ শেষে "মগ্ন" দিয়ে ফিনিশ করতে পারতে তা !

সুনীল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল—ইস্ সত্যি। শেষেরটা এই মিলটাই আসছিল কিন্তু উচ্ছ্বাসের জন্যে সব হারিয়ে যাচ্ছিল।

আবার একটা হাসির ঢেউ।

বাংলায় পণ্ডিত শেখর মিত্র এতক্ষণ চুপ করেছিল। সে বলল—সত্যিকারের জাত কবিরা কিন্তু মিলের জন্য অত ভাবে না। তাদের মিলগুলো আপনা হতেই আসে।

সুচরিতার এরা সবাই বন্ধু। কিন্তু কেউ পরস্পরকে সহ্য করতে পারত না। সময় পেলে বা সুযোগ পেলে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ছোবল দেবার চেষ্টা করত। এখানে তাই হল। সুনীল বোস শেখর মিত্রের কথা শুনে রেগে উঠল। বলল—কবিতা সম্বন্ধে আপনি কতখানি জানেন? পড়েছেন কি? ব্রাউনিন শেলী, বায়রন কিট্‌সের কবিতা? যদি না পড়ে থাকেন তাহলে পড়ে দেখবেন।

শেখর মিত্র একটু মুচ্‌কে হাসল, বলল—এম, এ পাশ করে আপনি যে এরকম ছেলেমানুষীর মত উত্তর দেবেন—আমি আশা করিনি!

সুনীল বলল—কবিতা সম্বন্ধে কেউ আমাকে কিছু বলতে এলে আমি সহ্য করি না। উত্তরটা ঠিকই দেওয়া হয়েছে। আপনি বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চ্চা করেন। আপনি কবিতার কি বুঝবেন?

শেখর মিত্র হেসে উঠল, বলল—কবিতা কি বাংলা ভাষা দিয়ে তৈরী নয়?

সুনীল বলল—অবশ্য তৈরী। তবে কবিতার আলাদা একটা ভাষা আছে যে ভাষা শুধু কবিতায়ই ব্যবহার হয়।

এই সময় অমিতা, সুখেন্দু আর ব্রততা ঢুকল।

সেইদিকে চেয়ে সুচরিতা বলল—সুনীল, শেখরদা তোমরা থামবে?

অমিতা, সুখেন্দু, ব্রততীকে দেখে সুনীল শেখর থেমে গেল। কিন্তু সুনীল গজরাতে লাগল—কবিতার অপমান যে করবে তাকে আমি কোন মতে ক্ষমা করব না।

সুনীলের গজরাণি চাপা পড়ে গেল সুচরিতার কথায়। সুচরিতা

সেই ফুলের পাহাড়ে বসেই আহবান করল এদের। বলল হেসে—সুখেন্দুবাবু কেমন লাগল? আপনার রুচি পালটেছে না এখনও সেই রকম আছে?

সুখেন্দু ম্লান একটু হাসল, বলল—রুচি একটা সহজাত বস্তু। যার স্বভাবের মধ্যে যে রকম থাকে ঠিক সেই রকমই হয়। সে পাল্টায়ও না বা পরিবর্ত্তিত ও হয় না। তবে আমি অস্বীকার করছি না। পালটায়। তবে সে যখন পালটায় তখন মানুষটাও সম্পূর্ণ পালটে যায়। আমি ত এখনও পালটাই নি সুতরাং আমার রুচি কেমন করে পালটাবে?

সুচরিতা একটু আহত হল, বলল—তাহলে আপনি ড্যান্স দেখেন নি?

—না।

—কেন?

—ঠিক ঐ কারণের জন্যেই। যে দিন ও রকম মন তৈরী করতে পারব সেদিন দেখব?

—এতখানি অহঙ্কার! তবে আমার সেই ঢঙে ছবি আঁকলেন কেন?

—একটা কারণের জন্যে?

—কি সে কারণ?

—যে যার ব্যক্তিগত প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করাই উচিত।

সুচরিতা মুখখানা বার বার আরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। সে মাথা হেঁট করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা তুলে বলল—তাহলে এই যে এত ফুল, এত লোক, সব কি তবে ভুল?

—আমার ত মনে হয় তাই। মানুষ একটা স্বার্থের জন্যেই ভুল করে!

—স্বার্থ। এতগুলো লোক তাহলে সব স্বার্থের জন্য আমাকে ভাল বলে?

—হ্যাঁ ঠিক তাই। যদি কেন জিজ্ঞাসা করেন বলে দিতে পারি।

এতগুলো লোক আপনার রূপ যৌবনকে উপভোগ করে বলেই তারা আপনার এত ভক্ত!

—কখনো নয়। হঠাৎ সেই বন্ধুবান্ধবরা চীৎকার করে উঠল। সুনীল বোস, সুবীর অধিকারী এগিয়ে এল—একজন ভদ্র মহিলার মান সম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বদা আমরা সচেষ্ট। আপনার কথা গুলো একটু সীমার মধ্যে রেখে উচ্চারণ করবেন।

সুচরিতা তাড়াতাড়ি ফুলের পাহাড় থেকে নেমে এসে ওদের সরিয়ে দিল। তারপর সুখেন্দুর কাছে সরে এসে হেসে বলল—এতক্ষণ ত ঝগড়াই করলেন? কই বোনের সঙ্গে ত পরিচয় করিয়ে দিলেন না?

ব্রততী এতক্ষণ হাঁ করে সুচরিতার অঙ্গ ভঙ্গি আর কথা-বার্ত্তাগুলো শুনছিল। তার অবাক লাগছিল সুচরিতার কথা শুনে। এত সুন্দর করে যে নাচতে পারে সে এত দাম্ভিকা? তাই একটু কেন বেশ খানিকটা রাগ হয়েছিল। বিশেষ করে দাদাকে কিছু বলতে। সুচরিতা আলাপ করতে চাইলে তাই সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল ব্রততী—দাদা, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, যাবে না।

সুচরিতা এগিয়ে এসে ব্রততীর হাত ধরল। হেসে বলল—আমার সঙ্গে আলাপ না করেই পালাবেন? আপনার দাদার সঙ্গে ঝগড়া আমার রোজ হয়। তার জন্য মনে কিছু করবেন না? উনিও খানিকটা দম্ভ প্রকাশ করেন আর আমিও খানিকটা। উনিও ভাঙ্গবেন না আমিও ভাঙ্গব না। উনি আধুনিক মনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। আমি ও আধুনিক মনের সপক্ষে। তারপর অমিতার দিকে তাকিয়ে সুচরিতা হেসে বলল—কি রে তুইও কি রাগ করেছিস্ নাকি? অমন মুখ করে দাঁড়িয়ে আছিস্? দেনা সুখেন্দু বাবুর বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে! তুই ত নিজে আগে সে কাজটা সেরে রেখেছিস্।

অমিতা বলল—কেউ যদি আলাপ করতে উদগ্রীব না থাকে তাহলে কেমন করে আলাপ করিয়ে দেব বল?

সুচরিতা বলল—কেন উনি কি আমার সঙ্গে আলাপ কর'বেন না?

সুখেন্দু বলল—এটাও কিন্তু আপনি ভুল বললেন সুচরিতাদেবী। আলাপ যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় না করতে চায় তাহলে কেনর প্রশ্ন কি সেখানে আসে?

সুচরিতার মুখখানা আবার আরক্ত হয়ে উঠল। বলল—বেশ। যদি কোন দিন আলাপ করার উপযুক্ত হই তাহলে না হয় করবেন। তবে আলাপ করবার জন্যে আমারও খুব ব্যগ্রতা নেই। আজ যেচে আলাপ না করলেও অনেকে আমার কাছে যেচে আলাপ করতে আসে। আলাপ করার লোকের কি আর আমার অভাব আছে?

সুখেন্দু যেন আজকে মরীয়া হয়ে উঠেছে। বার বার সুচরিতাকে অপমান করবার সুযোগ সে কিছুতে ছাড়ছিল না। বলল—আপনার সঙ্গে যাঁরা আলাপ করতে আসেন তাঁরা সেই রকমই লোক। যারা মেকী জিনিষের ব্যবসা করে তারা তাড়াতাড়ি বিক্রী করবার জন্যে ব্যস্ত হয়। যাদের আসল জিনিষ আছে তারা অত ব্যগ্র হয় না। তাদের জিনিষ আপনা হতেই বিক্রী হয়।

ব্রততী তাড়া দিল—দাদা রাত্রি হয়ে যাচ্ছে!

সুচরিতা বলল—তবে এ কথাটা নিশ্চয় জানেন আশা করি সুখেন্দুবাবু? মানুষ অপমানিত হলে সে অপমান ফিরিয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করে?

সুখেন্দু হাসল, বলল—জানি। আর জানি বলেই বলছি, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমি ত এক সামান্য লোক। অপমান সহ্য করবার মত শক্ত বুক আমার সর্ব্বদাই রাখতে হয়!

হঠাৎ সুচরিতা হেসে উঠল, বলল—আজ থাক্ সুখেন্দুবাবু? অনেক হয়েছে। কাল আসছেন ত! তারপর বসে বসে না হয় তর্ক করা যাবে। ওদিকে ছবিটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে ত! বাবা লণ্ডনের এক একজিবিশন কমিটীর সঙ্গে করসপণ্ডেও করছেন। হয়ত খুব শীগ্রি ছবিটা পাঠাতে হবে।

সুখেন্দু, ব্রততী আর অমিতা বেরিয়ে এল।

যাবার সময় সুচরিতা অমিতাকে হেসে বলল—তুইও চললি অমিতা?

অমিতা একটু ইতস্ততঃ করে বলল—ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেছিস? বোনটা ভাত নিয়ে বসে থাকবে যেতে হবে না?

সুচরিতা হাসল, বলল—বোন ত রোজই ভাত নিয়ে বসে থাকে। আজ বুঝি একটু বেশী তাড়াতাড়ি?

একটা ছোট্ট ইঙ্গিত। শিক্ষিতা মেয়ে অমিতার বুঝতে বাকী রইল না। মুখটা তার আরক্ত হ'য়ে উঠল। তারপর ভুরু দুটো একটু কুঁচকে পালিয়ে এল।

—ব্রুট, ইডিয়ট, ননসেন্স।

যত ইংরিজী গালাগালি ছিল সুচরিতার বন্ধুবান্ধবরা ওরা বেরিয়ে গেলে দিতে লাগল।—উঃ ভিখারীটার স্পর্দ্ধা দেখেছ? যেন মনে করে নিজে একটা কি না কি? তুমি নিষেধ করলে সুচরিতা তাই, না হলে ফিজিক্যালী হিটটা দিয়ে একবার দেখতাম। এতদূর স্পর্দ্ধা! বলে কি না তোমাকে শ্রদ্ধা করি তোমার রূপ যৌবন দেখে?

সুচরিতা কি যেন একটা কথা ভাবছিল। হঠাৎ একটু হেসে বলল—কথাটা সুখেন্দুবাবু কিছু খারাপ বলেননি? বরং সত্যি কথাই বলেছেন।

নিরুৎসাহ হয়ে গেল বন্ধু-বান্ধবের দল। যতখানি জেগে উঠেছিল তার চেয়ে অনেকখানি নিস্তেজ হয়ে গেল। গ্রীণরুমটায় একেবারে নীরবতা নেমে এল।

এমন সময় শো এর কর্ত্তারা এসে সুচরিতাকে বলল—তাহলে মিস মুখার্জী যাবার ব্যবস্থা করব ত!

সমস্বরে সব কজনাই বন্ধুবান্ধব চেঁচিয়ে উঠল—না-না আপনাদের কোন ব্যবস্থা করতে হবে না। সুচরিতা দেবী আমাদের সঙ্গে যাবেন।

কর্ত্তারা আচ্ছা বলে চলে গেল।

সুচরিতা নিজের রিষ্টওয়াচে দেখে নিল—দশটা পাঁচ। বলল—চল তাহলে বেরোই অনেক রাত্রি হয়ে গেছে।

সবাই গ্রীণরুম থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল [illegible] সমস্যা দেখা দিল সুচরিতা কার গাড়ীতে যাবে? যাঁর গাড়[illegible] যাবে সেই অসন্তুষ্ট হবে। সেটা সুচরিতা জানত। অথচ নিজে গাড়ী আনে নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও একটু চিন্তা করে নিল।

কেউ তার গাড়ীর প্রপোজাল দেবার আগেই সুচরিতা বলল—তোমরা সবাই চলে যাও, আমার একটু যেতে দেরী হবে।

ওমনি সবার কাতর মুখে একটা ছায়া পড়ল। এমন মুখগুলো হল যেন এখুনি ভিক্ষা না দিলে হার্টফেল করবে! শুধু তার মধ্যে প্রবীর কি একটা গোপন ইঙ্গিত বুঝে তাড়াতাড়ি কোনরকম উচ্চবাচ্য না করে সে গাড়ীর চাবি খুলে গাড়ীতে গিয়ে ষ্টার্ট দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল।

আর বাকী ক'জনা তখন আর কি করবে? প্রবীর যখন বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল তখন তাদের আর কি বলার থাকতে পারে? তবু কয়েক মিনিট সবাই দাঁড়িয়ে রইল সুচরিতা কিছু বলে কি না। কিন্তু সেদিক থেকে কোন উত্তর এল না। বরং সুচরিতা আবার তাড়া দিল—কই দাঁড়িয়ে রইলে যে সব!

সবাই গিয়ে নিজেদের স্ব স্ব গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। সবাই জানত যে প্রবীর কিছুক্ষণ পর ফিরে আসবে তবু কিছু বলার নেই। যদি একটু তার মধ্যে মনটা অন্যমনা হয়। যদি প্রবীরকে ছেড়ে সুচরিতার দৃষ্টি তাদের মধ্যে একজনের ওপর পড়ে। আশা। এমন একটী মেয়ের বাহুলগ্ন হওয়া! অনেক তপস্যা করলে তবে পাওয়া যায়! এর জন্যে যদি প্রাণও যায় তবুও মনে কোন ক্ষোভ থাকে না।

পাশে বেয়ারা ফুলগুলো বুকে করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

আর সুচরিতা। আর সবাই যে যার গাড়ী নিয়ে চলে গেল 'গুড নাইট' বলে।

সুচরিতা দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর প্রবীরের গাড়ী এসে উপস্থিত। বেয়ারা প্রবীরের গাড়ীতে ফুলগুলো তুলে দিল। সুচরিতা উঠে প্রবীরকে বলল—একটা ভাল বার প্রবীর। একটু ড্রিঙ্ক। আজ মনটা বড় খারাপ লাগছে।

প্রবীর হাসল, বলল—আচ্ছা।

গাড়ী এসপ্লানেড ধরে ছুটল।

তারপর গাড়ীর মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। সুচরিতাও কথা বলল না, প্রবীরও না।

কিছুক্ষণ পর।

একটা ভাল বার দেখে প্রবীর গাড়ী থামাল। তারপর সুচরিতা ও প্রবীর ভেতরে ঢুকল।

এদিকে যখন সুচরিতা এক বারে। তখন তার বাবা ডাক্তার অনিমেশ মুখার্জীকে এম, বি, এফ, আর, সি, এস (লণ্ডন) দেখা যাচ্ছে একটি নার্সের ঘরে ড্রিঙ্ক করছেন। নার্সটির নাম প্রতিভা সিংহ।

সুচরিতার মা মারা গেছেন আজ দশ বৎসর। অনিমেশবাবু আর কোন দারপরিগ্রহ করেন নি। সুচরিতা জানত—বাবা আর কেন দার পরিগ্রহ করেন নি? শুধু যে কন্যাস্নেহ তা নয়। এই জীবন-যাপন করবার একটা মোহ। এদিকে অনিমেশবাবু যেমন পাপের পঙ্কে ডুবে গিয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে আছেন তেমনি তার মেয়ে। বলবার তাদের পরস্পরকে কিছু নেই। শুধু লুকোচুরি খেলা। সুচরিতার ও কোন অভাব নেই। শুধু যা একটু স্নেহ। সে স্নেহ আজকাল আর তার দরকার হয় না। আজকাল তার আর সময় নেই! আগে পড়াশুনা ছিল। এখন বন্ধুবান্ধব, আর ড্যান্স। এখন আর মনের মধ্যে কোন অভাব অনুভব করে না। মা, মাসি,

খুড়ী, পিসী, দিদি কোন নারীর স্নেহ। এমন কি বাবাও অনেক সময় মেয়েকে ভুলে যান। তাতেও সুচরিতার কোন অসুবিধা হয় না। হাই ড্রিম, হাই থিঙ্ক আর হাই সোসাইটী। মাঝে মাঝে বার থেকে টলতে টলতে বাড়ী ফিরে চাকরটাকে যখন জিজ্ঞাসা করে—ভুলু, বাবা আসেন নি ?

ভুলু ইতস্ততঃ করে বলে—প্রতিভা দেবী এসেছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন আপনাকে খেয়ে নিতে, তিনি অনেক রাত্রে ফিরবেন।

শুধু প্রতিভা নয়, প্রতিমা, শীলা, মলিনা কত মেয়ে যে নিত্য নতুন পালটান তার ইয়ত্তা নেই। সুচরিতা শোনে আর মনে মনে হাসে। ব্যথাও কি মনে মনে পায় না ? তবে বোঝা যায় না। এই যা।

সকালবেলা সুচরিতা হয়ত কোন কাজে বেরিয়ে গেল। তারপর আর বাবার সঙ্গে তার সারাদিনে দেখা হল না। সুচরিতা যখন ফিরল বাবা বাড়ী নেই। বাবা যখন বাড়ী ফিরলেন, সুচরিতা হয়ত তখন ঘুমচ্ছে কিংবা বেরিয়ে গেছে। এরকম তাদের মাসের পর মাস এক এক সময় চলে যায়।

জানে সব শুধু ভুলুয়া। এক এক সময় সে এত বড় বাড়ীতে হাঁফিয়ে ওঠে। একটা পনের বছরের ছেলে। মাত্র কয়েকটা মাস এ বাড়ীতে এসেছে। কোন কাজকর্ম্ম তার নেই। শুধু যখন কর্ত্তামশাই বাড়ী থাকেন আর দিদিমণি থাকলেএকটু পরিচর্য্যা করে। তারপর লম্বা অবসর।

দিন আর ভুলুর কিছুতে কাটতে চায় না। কত আর ঘুমবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে চোখ ছুটো ফুলে গেল।

তাই একদিন ও সুচরিতাকে বলেছিল। অনিমেশ বাবুকে বলতে সাহস করে নি। ভুলুয়া তাকে ভীষণ ভয় করে।—দিদিমণি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। এত বড় বাড়ীতে আমি আর একা থাকতে পারছি না।

সুচরিতা শুনে হেসেছিল। তারপর বিস্মিত হয়ে বলেছিল—কেন ঠাকুর ত রয়েছে?

ভুলুয়া বলেছিল—ঠাকুর ত দুবেলা রান্না করেই পালিয়ে যায়। তাকে বললেও সে থাকে না।

—আচ্ছা ঠাকুরকে বলে দেব খন। সুচরিতা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঠাকুরকে বলতে সুচরিতা পারে নি। ভুলে গিয়েছিল।

একদিন ভুলুয়া পালিয়েও গিয়েছিল। অনিমেশ বাবু ভুলুয়ার কাকার বাড়ী থেকে আবার তাকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন।

ঝড়ও হয়নি। বৃষ্টিও হয়নি। শুধু গর্জ্জন হয়ে গেছে। এখন সব চুপ চাপ। শুধু মেঘ আকাশে।

ঘরে বসেছিল হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজরে সুখেন্দু। একটু দূরে কোণে একটা পুঁটলীর সামনে বসেছিল ব্রততী। পড়ছিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লাল গীতা থেকে গীতার কয়েকটা শ্লোক। পুঁটলীতে আরও কয়েকটী বই রয়েছে। অনেকগুলো ঠাকুর দেবতার পাঁচালী, একটা ছেঁড়া মহাভারত, একটা রামায়ণ। ব্রততীর ঠাকুমা যখন মারা যান তিনি এই সম্পত্তিগুলো ব্রততীকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোকগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ থেমে ব্রততী সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল—দাদা! কই শুনছ না? আমি যে তোমাকে শোনাবার জন্যেই এগুলো নিয়ে বসলাম।

সুখেন্দু হাঁটু থেকে মাথা তুলল। তারপর ম্লান হেসে বলল—শুনছি ত! থামলি কেন বলে যা!

—হ্যাঁ তুমি শুনছ! আমি বুঝি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

সুখেন্দু আবার ম্লান হাসল।

তাই দেখে ব্রততী বলল—আমি এত বললাম তবু শুনলে না? বললাম যে, বাবা মা অতশত বোঝে না। বলেছেন তার জন্যে মন খারাপ কর না। অত ঠুনকো মন নিয়ে চললে কি বড় কিছু করা যায়? অসুস্থ শরীর আর ভেব না। বরং অমিতাদির মার ছবিটা আঁকতে বস মনটা অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

সুখেন্দু আবার ম্লান হাসল। বলল—না আর এখন আঁকব না। মনটা অন্যমনস্ক থাকলে আঁকা কি যায়?

ব্রততী বলল—তাহলে এক কাজ কর, আমি গীতা থেকে শ্লোকগুলো পড়ে শোনাচ্ছি একটু মন দিয়ে শোন, মনটা শান্ত হয়ে যাবে।

সুখেন্দু চুপ করে রইল। ব্রততী পড়তে লাগল

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্,
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কিন্তু সুখেন্দুর মনটা আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল। ব্রততী এক সময়ে পড়া থামিয়ে সুখেন্দুর দিকে আবার তাকিয়ে দেখল। দেখল সুখেন্দুর দুই চোখে জল।

আঘাতটা সত্যিই বড় নিদারুণ। সকালবেলা সুখেন্দুর মা আর পঙ্গু বাবা সুখেন্দুকে যা বলেছেন তাতে কোন মানুষের সুস্থ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে না।

সুখেন্দু কদিন ধরে অত্যাধিক পরিশ্রমের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আর সে পরিশ্রম সুচরিতার ছবিটা শেষ করার জন্য। সুখেন্দুর আগ্রহ সুচরিতার ছবিটা শেষ হলে একশটা টাকা তাড়াতাড়ি পাবে। আর সুচরিতাদের আগ্রহ ছবিটা শেষ হলে তারা নাকি বিদেশে কোন এক একজিবিশনে পাঠাবে। দুটো আগ্রহকে মিলিত করে সুখেন্দু পরিশ্রম করেছিল অপরিসীম।

যে দিন শেষ হল সেদিন বিরাট যন্ত্রণা মাথার মধ্যে। টলতে টলতে কোনরকমে বাড়ী আসতে ব্রততী কপালে হাত দিয়ে শিউরে উঠল—দাদা একি ? তোমার গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ?

তারপর সেই শোওয়া।

ঘরে পয়সা নেই। কারুর অবলম্বন নেই। শুধু সম্বল মনের বল। সাতদিন একভাবে মাথায় জলপটী দিয়ে আর ঠাকুরকে ডেকে শেষ পর্য্যন্ত ব্রততী জ্বর ছাড়াল। কিন্তু সুখেন্দু উঠে বসতে পারল না। সারা শরীরে ভীষণ ব্যথা। আবার দিন কয়েক।

তারপর উঠল এই দিন দুয়েক আগে। এখনও শরীরে বল ফিরে আসেনি। উঠতে গেলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। সুখেন্দু কয়েকবার উঠতে গিয়েছিল কিন্তু ব্রততী তর্জনী দেখিয়ে শাসন করেছে—দাদা মনে রেখ, তুমি এখনও তোমার বল ফিরে পাও নি ?

সুখেন্দু ম্লান হেসে আবার শুয়ে পড়েছে। তবু একবার কাকুতির সুরে বলবার চেষ্টা করেছিল ব্রততীকে—ব্রত, একটু আমায় উঠতে দে ভাই, সুচরিতা দেবীর ছবিটা ত শেষ হয়ে গেছে। এখন গেলে হয়ত টাকাটা পেয়ে যাব।

কিন্তু ব্রততী কিছুতে উঠতে দেয়নি। বলেছে—আগে টাকা, না তুমি। তুমি বেঁচে থাকলে অনেক টাকা হবে। তোমাকে টাকার জন্যে অত ভাবতে হবে না। আমি ত রয়েছি।

তবু ব্রততী একটা জিনিষ গোপন করে রাখবার চেষ্টা করেছে সে হচ্ছে সুচরিতাদের বাড়ীর একটা ব্যাপার।

সুখেন্দু যখন রোগশয্যায় অজ্ঞানের মত বেহুস জ্বরে পড়েছিল। একদিন অমিতা এসেছিল। সেই অমিতা সেন। যার সঙ্গে ওদের ষ্টেজে আলাপ হয়েছিল। তারপর অবশ্য ব্রততী আর সুখেন্দুর সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে অমিতার। অমিতাই উপযাচক হয়ে সুখেন্দুদের বাড়ী এসেছিল।

সুখেন্দুর আঁকা দেখে সে ত প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

যাই হক্ অমিতা বলল ব্রততীকে সুচরিতাদের বাড়ীর সব ইতিহাস। সুচরিতা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় যেন চলে গিয়েছে। কারণটা জানতে পারলাম। কে একজন নার্স। একদিন তার বাবা সেই নার্সটাকে নাকি এনে রাত্রিকালে বাড়ীতে রেখেছিলেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সুচরিতার চক্ষুস্থির।

বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা এ কাকে এনেছ?

অনিমেশবাবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন—ভেবেছিলাম আর নিজেকে সংসারের মধ্যে জড়াবো না। কিন্তু এ মেয়েটা আমাকে না জড়িয়ে ছাড়বে না। তাই ভাবছি বাড়ীতে তুই ছাড়া ত আর দ্বিতীয় কোন মহিলা নেই। আর তা ছাড়া মায়ের স্নেহ তুই কখনও পাস্নি। তাই……। অনিমেশবাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন।

সুচরিতা সবই বুঝতে পেরেছিল। তাই হঠাৎ সে চটে উঠল। বলল—এতকাল মা হারা হয়ে রইলাম আজ হঠাৎ।

তারপর ও রাগে দুঃখে একেবারে পাগলের মত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর দিন অনিমেশবাবু সুচরিতার ঘর থেকে একটা চিঠি পেলেন। সুচরিতা লিখেছে—

বাবা—

তোমার কোনকিছুই আমি নিলাম না। তুমি তোমার সমস্ত বিষয়-আশয় আমার নতুন মাকে দিও। আমাকে খোঁজার চেষ্টা কর না। আমি যে কোথায় থাকব কিছুই বলতে পারব না।

অমিতা বলল—ব্যাপারটা সব অবশ্য জানতে পারলুম না। সুচরিতাকে ডাকতে গিয়ে ওদের বাড়ীর সেই বাচ্চা চাকরটা সব বলল। সে বলল, দিদিমণি চলে যাবার কদিন পরে নতুন মাকে নিয়ে কর্ত্তাবাবুও কোথায় চলে গেছেন। শুধু আমাকে একশটা টাকা দিয়ে বলে গেলেন, "তুই আর ঠাকুর মাসখানেক এ বাড়ীতে থাকিস্।

আমি একমাসের মধ্যেই ফিরব।" তবে কর্তাবাবুর জিনিষপত্তর নেওয়া দেখে বুঝলাম তিনি অনেক দূরেই যাচ্ছেন।

অমিতার কাছে সব শুনে ব্রততী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তারপর একটু ভেবে অমিতাকে বলল—অমিতাদি একটা অনুরোধ। দাদাকে এ খবরটা বলবেন না। দাদার অনেক আশা। সে আশা যদি হঠাৎ এমনি করে শূন্যে মিলিয়ে যায় তাহলে দাদা পাগল হয়ে যাবে!

অমিতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি সে আশা? তবে কি—? হঠাৎ ও চুপ করে গেল। চেয়ে রইল ব্রততীর দিকে।

ব্রততীও আর কিছু বলল না।

এমনি করে সুখেন্দুর একশ টাকার শোক ব্রততী গোপন করে রাখল। কিন্তু কতদিন রাখবে? একদিন ত সুখেন্দু জানতে পারবে! তখন!

অথচ আজ মাত্র দুদিন অসুখ থেকে উঠেছে। ধুঁকছে। সকালবেলা সুখেন্দুর মা নীরদা আর পঙ্গু সুধাকান্ত বাবু দুজনে একসুরে সুর মিলিয়ে যে সব কথার বর্শাগুলো ছুঁড়তে শুরু করলেন তা সুখেন্দুর পক্ষে সহ্য করা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল।

প্রথমে সকালে উঠে মা নীরদাই বলতে আরম্ভ করলেন—আশা ছিল উপযুক্ত ছেলে হলে একটু ভালমন্দ খাব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এমন কপাল হবে কে জানে?

বাতে পঙ্গু সুধাকান্ত বাবু যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে বললেন—কেন আর্ট করছে? আর্টে পেট ভরছে না! নাম হবে, যশ হবে। কাগজে নাম বেরবে। কেন? সেই সব এখন ধুয়ে খাও? তখনই বলেছিলাম আমার অফিসে একটা এ্যাপ্লাই করে দে। তা নয়। আর্ট করব। আর্ট করে একজিবিশনে পাঠাব। নাম পাব, টাকা পাব।

মা নীরদা বললেন—এমন ছেলে গর্ভে ধারণ করেও আমার পাপ হয়েছে। উপযুক্ত ছেলের কাছ থেকে যদি এইরকম ব্যবহার পাই তাহলে এ জীবন রেখে লাভ কি ?

সুধাকান্ত বাবু বললেন—দূর করে দাও। যত সব অপোগণ্ড গুলোর জন্ম হয়েছে ?

মা নীরদা বললেন—আছে কেন ? চলে গেলেও ত পারত। জানব আমার ব্রতী যেখানে গেছে সেখানে ও গেছে। চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে আর তুলি রঙ নিয়ে কাগজ ভরাবে। খাবার যে কি করে জোটে ! ঐ একটা ডাগর মেয়ে তার যা মুরোদ আছে, একটা মদ্দ ছোঁড়ারও সে মুরোদ নেই।

ব্রততী মাকে থামাবার চেষ্টা করল,—আঃ মা তুমি থামবে ! দাদা কদিন্ ধরে অসুখে ভুগে উঠল।

—থাম বাপু। তোকে আর দরদ দেখাতে হবে না।—দরদ আমারও থাকত যদি ছেলের মত কর্ত্তব্য করত।

সুখেন্দু বসে বসে অমিতার মায়েব ছবিটা আঁকছিল। মাঝে মাঝে তার হাত কেঁপে উঠতে লাগল। চোখে তার জল। দৃষ্টিটা কাতর।

এদিকে মা নীরদাসুন্দরী আর সুধাকান্ত বাবুর গলা সপ্তম থেকে সপ্তমে। মানুষ যে এমন করে তার সন্তানকে বলতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। হাজার হোক নিজের রক্তের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে ত ! হোক না কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন। তাই বলে এমন করে বলা !

শেষকালে ব্রততীর সঙ্গে বাপ মায়ের ঝগড়া সুরু হয়ে গেল। ব্রততী রেগে গিয়ে বেশ কড়া করে শুনিয়ে দেবার চেষ্টা করল, বলল—লজ্জা ত তোমাদেরই করা উচিত মা ? আমরাই বা তোমাদের কাছ থেকে কি পেয়েছি, যার জন্যে তোমরা আমাদের কাছ থেকে চাইছ ?

মা নীরদা একটু দমে গেলেন। হাজার হোক পয়সা দিচ্ছে ব্রততী। ওকে ত খুব বেশী বলা যায় না। তাহলে যদি পয়সা

দেওয়া বন্ধ করে দেয়। বলতে ছাড়লেন না কিন্তু সুধাকান্ত বাবু। খেঁকিয়ে বললেন—চাস্ আর কি? জগতে দেখত শিখলি কার দেখ্‌তা? শুধু আমাদেরই কর্ত্তব্য আছে? তোদের কিছু নেই?

ব্রততী বুদ্ধিমতীর মত চুপ করে গেল।

অবশ্য আরও কিছু বলত যদি না মা নীরদা গিয়ে সুধাকান্ত বাবুকে চুপ করিয়ে দিতেন। মা নীরদা ফিস্ ফিস্ করে সুধাকান্ত বাবুকে বললেন—তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? কাকে কি বলতে হয় ভুলে গেছ? ওকে এমন করে বলছ ও যদি পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দেয়?

—তা বলে অত ভয় করে চলতে হবে? সুধাকান্ত বাবু খেঁকিয়ে উঠলেন।

—না, তবে উপোস করতে পার কর? যে গরুটা দুধ দেয় তার লাথিও সহ্য করতে হয় এ কি ভুলে গেছ?

ব্রততী শুনে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে সরে এল। হায়রে অর্থ। হায়রে মানুষ। কোন সম্বন্ধ নেই। কোন মায়া নেই।

ছুটে গিয়ে ব্রততী সুখেন্দুর নত মুখখানা তুলে ধরল, বলল—দাদা তুমি কাঁদছ! ছিঃ দাদা তুমি আমাদের বড়। তুমি যদি এরকম অধৈর্য্য হয়ে পড়।

ব্রততীর আরও ছোট্ট ছোট্ট দুটো ভাই বোন ছিল। মলয় আর রুনী। সে দুটোও দিদির সঙ্গে দাদার মুখের দিকে কাতর হয়ে তাকিয়ে রইল।

তারপর ব্রততী তার পুঁটলীটা নিয়ে এসে তা থেকে লাল গীতাটা বার করে শ্লোক পড়ে পড়ে দাদাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল্।

কিন্তু এত দুঃখ যার তার কি গীতার কোন শ্লোক কানে ঢোকে। বার বার সুখেন্দু হারিয়ে ফেলতে লাগল নিজের সত্ত্বা। আর ব্রততী বোঝাতে লাগল।

শেষকালে ধৈর্য্য আর না ধরতে পেরে সুখেন্দু জামাটা গলিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ব্রততী বাধা দিতে গেল কিন্তু পারল না। বলল—দাদা তোমার অসুস্থ শরীর আজ বেরিও না। মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেলে আমরা কেউ জানতে পারব না।

সুখেন্দু চলে যেতে যেতে গলা জড়িয়ে বলল—জানতে হবে না। আমার কথা তোরা একটু কম করেই ভাবিস্।

ব্রততী খুব কম কাঁদে। ব্রততীও কেঁদে ফেলল। মাকে এসে বলল—দিলে ত অসুস্থ মানুষটাকে বাড়ী থেকে বার করে? তোমাদের যে কি বলব মা?

মা নীরদা মিওনো গলায় বললেন—আমি কোথায় বার করে দিলুম? ঐ ত নিজে ·। মা নীরদা দেবী খুব বেশী বলতে সাহস করেন না। তার মত—যে গরু দুধ দেয় তার সব সহ্য করতে হয়! ব্রততীর দাম যে এখন লক্ষ টাকা।

কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক পরে সুখেন্দু ফিরে এল। ফিরে এল ঝড়ের মত। এসে থপ্ করে একটা জায়গায় বসে পড়ল।

ব্রততী বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করল কাছে এগিয়ে—দাদা, তুমি কি সুচরিতা দেবীদের বাড়ীতে গিয়েছিলে?

সুখেন্দু মাথা নাড়ল—হ্যাঁ।

ব্রততী বলল—কি দেখলে ওরা কেউ নেই ত?

সুখেন্দু অবাক বিস্ময়ে ব্রততীর মুখের দিকে তাকাল, জিজ্ঞাসা করল—তুই কেমন করে জানলি?

ব্রততী তখন মাথা হেঁট করে আদ্যোপান্ত বলল। তারপর বলল—তোমার কাছে গোপন করেছিলাম শুধু তুমি আঘাত পাবে বলে।

সুখেন্দু ম্লান হাসল, বলল—কিন্তু আঘাত থেকে বাঁচাতে ত পারলি না?

ব্রততী চুপ করে রইল।

তারপর কিছুক্ষণ পরে ব্রততী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল—অমিতাদির মায়ের ছবিটা এবার শেষ করে দাও, ও ত সাতদিন পরে আসবে বলেছে।

সুখেন্দু ম্লান হাসল, বলল—আবার যদি ও ফাঁকী দেয় ?

ব্রততী বলল—না, ও বলেছে নিয়ে যাবার সময় একেবারে টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে।

সুখেন্দু ম্লান হাসল, বলল—কিন্তু যদি আর নাই আসে ?

ব্রততী একটু আঘাত পেল, বলল—আসবে সে। মানুষ চিনতে কি ভুল হয় ?

সুখেন্দু চুপ করে রইল।

ব্রততী আবার বলল—আর তুমি যা ভাবছ, সুচরিতা দেবীও ফাঁকী দেবেন না। হয়ত বাবার সঙ্গে গণ্ডগোলের জন্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাই টাকাটা দিয়ে যেতে পারেন নি। দেখবে, একদিন মনিওর্ডার করে ঠিক পাঠিয়ে দেবেন। দুর্ণাম আর যা কিছু থাকতে পারে। তোমার পারিশ্রমিক তিনি মারবেন না। আমি তাকে দেখেই বুঝেছিলাম।

সুখেন্দু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—বেশ, সেই বিশ্বাসেই থাক্।

• আলু ছাড়ানর কারখানা।

ব্রততী সেই কারখানায় কাজ করত। কারখানাটী বড় নয় ছোট। তবে ছোট বললেও ভুল বলা হবে। কারণ কারখানার পরিধি ছোট হলেও যে সংখ্যক মেয়েরা সেখানে কাজ করত, কোন বড় কারখানায়ও নেই। প্রায় শ'খানেক।

আলু ছাড়ানর কারখানা। শুধু মণ মণ সেদ্ধ আলুই সেখানে ছাড়ান হয়। আর সেই সব আলু কলকাতার প্রায় অধিকাংশ দোকানে চালান হয়। এ কারখানার ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটর—রতিকান্ত বাগচী। নব কার্ত্তিকের মত চেহারাওয়ালা একটা লোক। বাপের ব্যবসা পেয়েছে। সেইজন্যে একটু চালিয়াৎ প্রকৃতির আর একটু দুষ্ট দৃষ্টিভাবাপন্ন। এখনও বিয়ে করেনি। মেয়েদের দেখলে দিশী ধুতির পাকানো কোঁচাটা পকেট থেকে বার করে ঝেড়ে নিয়ে আবার পকেটে রাখে। তারপর মুচকি হেসে ট্যারচা ভাবে মেয়েদের উর্দ্ধাঙ্গ লোলুপ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে।

কোন কোন যুবতী মেয়ে ম্যানেজারের ভাবটা বুঝতে পেরে একটু ঢলে পড়ে। তারপর হপ্তা নেবার দিন আর একটু ঢলে হপ্তাটা বাড়িয়ে নেয়।

ম্যানেজার আর একটু এগোলে অগ্নিকটাক্ষ। তবে যারা একটু চরিত্রবতী। আর যাদের এলো গেলো কোন কিছুতে এসে যায় না তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ম্যানেজার আছে বেশ। ব্যবসাও চালাচ্ছে আর মাঝে মাঝে……।

রুচিবোধের প্রশ্ন বললে অবশ্য আলাদা কথা। তবে আলু ছাড়ানর কোম্পানীতে কোন ভাল বংশের মেয়ে আর আসবে কেন? অবশ্য যারা পড়াশুনা শিখেছে। তাই অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর এই ঝি রাঁধুনী ক্লাসের মেয়েদেরই ভীড়। শুধু এর মধ্যে ব্রততী, মীনা, দেবলা আর দু একটী মেয়ে। এরাই যা ভাগ্যের ফেরে ছিট্‌কে এসে এই কারখানায় ঢুকে পড়েছে।

আর এদের দেখেই ম্যানেজারের রুচিবোধ পালটেছে।

ব্রততী এ কারখানায় কাজ করবার দু চারদিন পরের ঘটনা।

দেবলাকে নিয়েই ব্যাপারটা ঘটল।

আলু ছাড়িয়ে পাল্লায় ওজন করতে গিয়ে রতিকান্ত দেবলার হাত ধরে ফেলল।

সেয়ানা মেয়ে দেবলা। ভাগ্যের ফেরে এই কারখানায় কাজ করতে এসেছে। না হলে তার বাবার সম্মান অনুযায়ী তার এখানে কাজ করা উচিত নয়। বাবা রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। পেনসন নিয়ে ঘরে বসে থাকার জন্যেই দেবলাকে কাজে বেরুতে হয়েছে। অথচ ছোটবেলায় পড়াশুনায় অবহেলা করে পড়াশুনা করতে পারেনি। দেবলার কোন উপযুক্ত ভাই ছিল না। দেবলা বাবার মতই রাশভারী স্বভাব পেয়েছে।

দেবলাকে একটু দেখতে ভাল বলে ম্যানেজারের প্রথম থেকেই ওর ওপর একটু লক্ষ্য। তাই পাল্লার ওজন দেখতে দেখতে সেদিন ম্যানেজার মুচকে হেসে কি যেন একটা ইঙ্গিত করল।

আর যায় কোথা ম্যানেজার। মুখরা মেয়ে দেবলা। কোমরে কাপড়টা ভাল করে জড়িয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে রতিকান্তর দিকে তাকিয়ে বলল—ভেবেছেন কি? আপনার কারখানায় আমরা কাজ করি বলে আমাদের ইজ্জত নেই?

এমন মূর্ত্তি দেখবে রতিকান্ত আশা করেনি। ও ভেবেছিল—হয়ত সব মেয়ে যেমন প্রথম প্রথম এড়িয়ে যায় ও তেমনি এড়িয়ে যাবে। কিন্তু বিপরীত কিছু একটা হতে দেখে ও একটু ঘাবড়ে গেল। বলল আমতা আমতা করে—তা, তা আমি ইজ্জতের কথা কি বললাম? আমি ত শুধু....।

—থাক্ খুব হয়েছে? শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আর আপনাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। আমার হপ্তাটা দিয়ে দিন ত আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছি!

দেবলার মূর্ত্তি দেখে রতিকান্ত কেমন যেন একটু ঘাবড়ে গেল। এতকাল অনেক মেয়ের সঙ্গে সে মিশেছে কিন্তু এমন মেয়ে তার জীবনে এই প্রথম। সে তাই অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি হপ্তাটা হিসেব করে দেবলার হাতে তুলে দিল।

দেবলা চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—ইজ্জত যদি দিই

তাহলে আপনার মত দুশ্চরিত্রর হাতে দেব না এটুকু জেনে রাখবেন ? ভেবেছেন আমি বুঝি সেই জাতের মেয়ে······ ?

সেদিন সারা কারখানা স্তব্ধ। সব মেয়েগুলো ভয়ে কাঁপতে লাগল। এই বুঝি অপমানিত ম্যানেজার কার ঘাড়ের মাথা নেয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, ম্যানেজার উলটে বেজায় খুসী।

ব্রততীর সেদিন চাকরীর চতুর্থ দিন। সে ত এসব দেখে হকচকিয়ে গেল। তার এই প্রথম চাকরী। তবে এটুকু সে বুঝল যে এ লোকটী খুব সুবিধের নয়। সুতরাং সাবধানে থাকতে হবে।

তারপর সপ্তাহ খানেক আরও চলে গেল।

এর মধ্যে অনেক নূতন মেয়ে এল পুরণো মেয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন রতিকান্ত ব্রততী যেখানে বসে আলু ছাড়াচ্ছিল সেখানে এসে একদৃষ্টে ব্রততীর আলু ছাড়ানর কায়দাটা দেখতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ দেখে একটু মুচকে হেসে বলল—বাঃ চমৎকার ত আপনি ছাড়ান দেখছি ? দিনে কত করে ছাড়ান ?

এই লোকটার স্বভাব এই এক সপ্তাহে ব্রততীর জানা হয়ে গিয়েছিল। আর যা জেনেছিল তাতে এইটুকু তার বোধগম্য হয়েছিল যে লোকটী খুব সহজ পাত্র নয়। সুবিধে পেলে কারুকেই সে ছেড়ে কথা বলে না। তাই রতিকান্তর কথায় ব্রততীর দৃঢ় মনটা একটু কেঁপে উঠল। তারপর জড়িত গলায় বলল—আধমণ।

—আধমণ মাত্র ? রতিকান্ত হাসল। তারপর বলল—কিন্তু আপনার ত এত কম ছাড়ান উচিত নয়। এই কায়দায় অন্ততঃ আপনার মণ দুই ছাড়ান উচিত।

ব্রততী নিরুত্তর থেকে নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

রতিকান্ত আরও অনেকক্ষণ চেয়ে রইল লোলুপ দৃষ্টিতে ব্রততীর দিকে। ব্রততী অবশ্য তাকাতে পাচ্ছিল না। তার কেমন জানি ভয় ভয় করছিল। একটা ক্ষুধিত শ্বাপদ তার সামনে দণ্ডায়মান।

ব্রততীর বারে বারে হাত থেকে ভয়ে আলুগুলো পিছলে পড়ছিল। কাঁপছিল ঠক্ ঠক করে হাত দুটো। কপালে স্বেদ কণিকা।

রতিকান্ত বুঝতে পারছিল ব্রততীর অবস্থাটা। তবু কৌতুক অনুভব করছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রততীর রকম দেখে। আর হাসছিল মৃদু মৃদু। তারপর ব্রততীর চলমান হাত যখন আর চলতে চাইল না। তখন আর না দাঁড়িয়ে হেসে যাবার সময় ব্রততীর দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি যাবার সময় একবার দেখা করে যাবেন।

রতিকান্ত চলে গেল।

রতিকান্ত অদৃশ্য হতেই অন্যান্য মেয়েরাও এবার মর্ত্যে ফিরে এল এবং নড়ে চড়ে বসে হাঁফ ছাড়ল। বলল—বাব্বাঃ যেন যমদূত! যেতেই চায় না।

তারপর তারা ব্রততীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল—দৃষ্টিটা দেখে আশা করি বুঝতে পেরেছেন চোখ কোন দিকে?

ব্রততীর তখন কি শোনবার মত মন আছে? তার তখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। "হায় ভগবান কপালে শেষকালে এই লিখেছিলে?" আলু ছাড়ান তার বন্ধ হয়ে গেল। হাত আর চলে না। কপাল থেকে কেবল স্বেদ কণিকা মুক্তার মত ঝরতে লাগল।

সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্য্যন্ত ডিউটী। তার মাঝখানে একঘণ্টা টিফিন। বারে বারে ভীত এস্ত দৃষ্টিতে ব্রততী ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল।

অন্যদিন হলে কখন চারটে বাজবে সেই আশায় ব্রততীর প্রাণ ছটফট করত। আজ সে তার বিপরীতটাই আশা করতে লাগল। যেন এ কাল চারটে তাড়াতাড়ি না বাজে।

চারটে বাজলেই কাঠ গড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে! তারপর কি যে আদেশ হবে? সে জানতে ত আর এই কারখানার কেউ

বাকী নেই। এমন কি একটা দশ বছরের ফ্রক পরা মেয়ে—তার মার সঙ্গে এসে কাজ করে, সেও জানে। সেও অনেক সময় তার মাকে ফিস্ ফিস্ করে বলে—মা আমি অনেকদিন কাপড় পরব না? কাপড় পড়লে ম্যানেজারটাও যদি আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে।

ওর মা ধমক দেয়—আঃ টুণী, কাজ করছিস্ কাজ কর। জ্বালাতন করিস্ না!

কিন্তু চারটে না বাজার আশা করলেও একসময় বেজে গেল।

গেটের কাছে অফিস ঘর।

রতিকান্ত দরজার পাটা ধরে দাঁড়িয়েছিল।

ব্রততী গেটের কাছে আসতেই রতিকান্ত মুচকি হেসে ডাকল—এই যে আমি ডাকছিলুম?

ব্রততী মাথাটা একটু নীচু করে বলল—আজকে অপেক্ষা করতে পারব না। বাড়ীতে কাজ আছে। এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ব্রততী গেট পেরিয়ে চলে গেল।

কিন্তু এই একবার পালিয়েই কি রেহাই আছে? রোজ আবেদন। আর রোজ ব্রততীর পলায়ন। কারখানার অন্যান্য মেয়েরা দেখে হাসতে হাসতে বলতে লাগল—না, কথায় আছে না বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ম্যানেজারের দৃষ্টি যখন গেছে তখন তার খপ্পরে পড়া অথবা ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া এখন এই দুটোই চলতে পারে। আর এ রকম এড়িয়ে কতকাল থাকবে যদি হপ্তা বন্ধ করে দেয় তখন!

ব্রততী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। একদিকে ইজ্জত আর একদিকে বাড়ী। কোনটা রাখবে? যেটা হারাবে সেটাই মারাত্মক। চাকরী ছেড়ে দিলে সাত আটটী জীবন ধ্বংস। আর ইজ্জত দিলে সে ধ্বংস। উঃ! ব্রততী আর ভাবতে পারল না। শেষ পর্যন্ত কপালে এই ছিল! ভগবান, জগতে ন্যায়ের কি কোন মূল্য নেই?

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় বাড়ীতে সুখেন্দুর জর। সুচরিতা দেবী একশ টাকা না দিয়ে চলে গেছেন। বাড়ীতে চলছে সুখেন্দুর ওপর অত্যাচার। বাপ মা ছেলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করতে গিয়ে নিজেরা হাত পা ছুঁড়ে গগন বিদীর্ণ করছেন।

সুখেন্দু নিরুপায়। ব্রততী ভাবতে লাগল—এই অবস্থায় যদি সে ইজ্জত বাঁচাতে কাজ ছেড়ে দেয় তা হলে বাড়ীর সব কটা প্রাণী অনাহারে শুকিয়ে মরবে। অথচ নারীর কৌস্তভ রত্ন ইজ্জত।

দুদিন তিন দিন ধরে গভীর ভাবে ব্রততী ভাবতে লাগল। আড়ালে বসে বসে খুব খানিকটা কাঁদল। কিন্তু বাড়ীর কারুক্কে ব্যাপারটা জানতে দিল না।

ঠাকুরমার দেওয়া গীতার শ্লোকগুলো অনেক কষ্ট করে মুখস্ত করে রেখেছিল। সে গুলো শান্তি পাওয়ার জন্যে আওড়াল। কিন্তু শান্তি পেল না। ওর এত দিনের মুখস্ত করা শ্লোকের ওপর ওরই রাগ ধরে গেল। যত সব বাজে সান্ত্বনা! কিছু হয় না ও সব শ্লোক পড়ে। এতদিন যে এই শ্লোকগুলোকে চীৎকার করে মুখস্ত করল, শুধু পণ্ডশ্রম। ঠাকুমা ভুল সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন।

জীবনের আজ যত আশা ভরসা, স্বপ্ন, কল্পনা সব শেষ।

যে সব মেয়েরা যুবতী বয়েসে যা ভাবে ব্রততী ও তা থেকে স্বতন্ত্র কিছু ভাবে নি। একখানি সুন্দর ঘর, একটী স্বামী, একটী আদর্শ সংসার। আর কি? স্বামীর একান্ত ভালবাসা? তাই। আর—

একটী সন্তান। ফুটফুটে। দুধে আলতা গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ দুটো। আর—

সে যখন কথা বলতে শিখে 'মা' বলবে? আঃ—

সব মেয়েরা প্রায় একই ভাবে। ব্রততী ও কি ভাবে নি? সেও ভেবেছে। সেও ভেবেছে একদিন তারও নিশ্চয় বিয়ে হবে। দাদার একটা কিছু হলে দাদা নিশ্চয় ব্যবস্থা করবে।

পটে আঁকা ছবি

মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে তখন একেবারে বিফল হবে না কিছু, এ ধারণা ব্রততীর আছে।

কিন্তু।

এখন।

তারপর কয়েকদিন চলে গেল। সময় বয়ে যেতে লাগল। প্রায় এক মাস পর।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সুচরিতার কাছ থেকে মণিঅর্ডার করে একশটা টাকা সুখেন্দুর নামে এল।

সুখেন্দু সেদিনই লক্ষ্য করল ব্রততীকে। ব্রততীর যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন। সে আগের উৎসাহ। দাদাকে সান্ত্বনা দেওয়া। এমন কি কথাও যেন খুব কম বলে।

অথচ আজ কাল এ বাড়ীতে ব্রততীর জন্যেই সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। আকস্মিক সে নিত্যনতুন ভাল ভাল আহারদ্রব্যাদি নিয়ে বাড়ী ফিরছে। অনেক টাকা। নতুন একটা ভ্যানিটী ব্যাগ কিনেছে। টাকা চাইলেই পট করে ভ্যানিটী ব্যাগটা খুলে জিজ্ঞাসা করে—কত চাই!

চেহারাও অনেক পালটেছে। আগে কোন বিলাসিতার ধার ধারত না ব্রততী। আজকাল মুখখানা স্নো পাউডার ঘষে অপরূপ পালটেছে।

দেহেও অনেক পরিবর্ত্তন। রোজ প্রায় নতুন শাড়ী। এর মধ্যে এত শাড়ী ব্রততী কিনে ফেলেছে যে শেষ পর্য্যন্ত তাকে বড় একটা ট্রাঙ্ক কিনতে হয়েছে।

সব লক্ষ্য করেছে সুখেন্দু। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। সুযোগ পায় নি। আর একটা ভয়। যদি জিজ্ঞাসা করলে অন্য

কিছু ভাবে ব্রততী। তবু একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল সুখেন্দু—তুই কি অন্য জায়গায় কাজ পেয়েছিস্?

ব্রততী চলে যেতে যেতে উত্তর দিয়েছিল—না। পেলাম কোথায় আর!

আর কোন কথা নয়। যে সুখেন্দুর সঙ্গে ব্রততী ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করত। সেই ব্রততী কেবল এড়িয়ে চলে। আর বলে না এসে সুখেন্দুকে—দাদা তুমি মরে গেলে আমরা একজনকে হারাব কিন্তু তোমার সৃষ্টি মরে গেলে···তোমার সৃষ্টি মরে গেলে লক্ষ লক্ষ লোক যে বঞ্চিত হবে।

সুখেন্দু শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বোনের এ রহস্য বোঝার মত শক্তি তার নেই।

শুধু একটা কথা হঠাৎ সুখেন্দুর মনে এল। তবে কি ব্রততী অর্থ উপায় করে আর সে করে না বলেই এত উপেক্ষা? হয়ত তাইই হবে। মানুষের মন। মানুষের মন পরিবর্ত্তন হতে আর বেশী সময় লাগে কই?

তাইই হয়েছে। ব্রততী এখন টাকা উপার্জ্জন করছে। সে করছে না। ব্রততীকে বাড়ীর সবাই ভালবাসে। আর ব্রততীও দেখছে দাদা একটা অপদার্থ।

সুখেন্দু আঁকা স্থগিত রেখে কেবল আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ভাবে। আর তার চোখ দিয়ে নোনা জল দু চোখের খাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

সুখেন্দু পথে পথে ঘুরতে লাগল। খুঁজতে লাগল অর্থের সন্ধান। কিন্তু একটা অস্বীকৃতিবান্ আর্টিষ্টকে কে পয়সা দেবে?

অমিতার মায়ের ফটোটা এখনো আঁকা হয় নি। সেও আর আসে না। ভাল লাগে না।

এঁকে পয়সা উপায় হবে না। অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে।

পটে আঁকা ছবি

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে সুখেন্দু দেখে। নানান ফেরীওয়ালা। হরেক রকমের জিনিষের সম্ভার নিয়ে থরে থরে তারা ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর সব অধিকাংশই ভদ্রলোকের ছেলে। এমন কি তাদের জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে যে তারা বিদ্যায় বুদ্ধিতে কারও চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম্-এ।

বি-এ, এম্-এ, পাশ করে কাঁধে কতকগুলো কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে বিক্রী করছে। কোন লজ্জা নেই। উলটে জিজ্ঞাসা করলে বলে—ইক্‌নমিক্‌স পড়ে এইটে বুঝেছি যে প্রবলেম যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে মনি প্রবলেম।

পার্টিশন হওয়ার পর এই অবস্থা। আন্‌এম্প্লয়মেণ্ট বেকাররা আর কি করবে? তবু ছোটখাট ব্যবসা। স্বাধীন ব্যবসায় কোন অসম্মান নেই। তবে আজকাল দেখা যাচ্ছে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতাই বেশী। সহরের বড় বড় চৌমাথার মোড়ে অসংখ্যক শুধু বিক্রেতা। ফুটপাতে জিনিষপত্তর সাজিয়ে নিয়ে বসলে পাছে পুলিশের হুমকি খেতে হয় এই জন্যে তারা কাঁধে ঝুলিয়ে কিম্বা দু'হাতে করে ধরে চেঁচাচ্ছে—পকেট বুক। দু আনায় দু খানা পকেট বুক। কিনে নিন স্যার। প্রত্যেক সময়েই পকেট বুকের দরকার হয়। স্মরণীয় অনেক কথাই আপনি অনেক সময় ভুলে যান। পকেট বুকটা কিনুন। কিনে এবার তার মধ্যে লিখে রাখুন। দেখবেন আর ভুল হবে না। মাত্র এক আনা, দুই আনায় দু খানা।

আবার একজন। সে বিক্রী করছে সস্তা দামের জাপানী কলম। একটা সিল্কের পাঞ্জাবী পরেছে ভদ্রলোকটী। বেশ ধোপ-দুরস্ত পোষাক। বুক পকেটে প্রায় শ' খানেক কলম।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে—ইমিটেসন সেফার। মাত্র আট আনা। স্যর দিস্ ইজ ভেরি চিফ।

সুখেন্দু দাঁড়িয়েছিল ঠিক মোড়ের মাথায়। বিপরীত ফুটপাতে

সব ম্যাগাজিনের ভীড়। অসংখ্যক হিন্দুস্থানী হকার। তারা বসে আছে পাশাপাশি ফুটপাতে হরেক রকম ম্যাগাজিন নিয়ে।

সুখেন্দু ফেরবার জন্যে ডান পা-টা এগিয়ে দিল।

হঠাৎ কে যেন একজন দূর থেকে তার নাম ধরে ডাকল।

সুখেন্দু একবার উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নিল। কিন্তু কারুক্কে দেখতে পেল না।

হঠাৎ কাঁধে একটা ধাক্কা। সুখেন্দু চমকে উঠল। ফিরে দেখল পাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে।

সে বলল—চিনতে পারলি না ত' !

সুখেন্দু বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

—অসিতকে ভুলে গেছিস ?

—অসিত ? সুখেন্দু এবার একটু খুসী হয়ে বলল—অসিতকে ভুলেছি মানে ? কিন্তু তুই যে অসিত কি করে বলব! সুখেন্দু অসিতের আপাদমস্তক দেখে তারপর আবার একটু হাসল। হেসে বলল—চেহারার কোন জায়গায় তোর একটুও আগের চিহ্ন রাখিস নি।

অসিত হাসল। হেসে চাপা দিল সে কথা। চাপা দিয়ে বিস্ময়ে বলল—কিন্তু তোর এ কি অবস্থা ? ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়, একমুখ দাঁড়ি, মুখ শুকনো !

সুখেন্দু চুপ করে অসিতের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই অসিত। একসঙ্গে আর্ট কলেজে পড়ত। ভীষণ গরীব ছিল তারা। খেতে পেত না। কত দিন সুখেন্দুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে খেয়েছে। ঠিক তখন ছিল, তার আজকের সুখেন্দুর অবস্থার মত। অসিত আর সুখেন্দু। ভাব ছিল বড় বেশী বলে ক্লাসের অনেক সতীর্থরা ব্যঙ্গ করত তাদের তুজনকে নিয়ে।

সেই অসিতের আজ এতটা পরিবর্ত্তন দেখে সুখেন্দু একটুও তাকে চিনতে পারে নি।

অসিত আবার জিজ্ঞাসা করল—কি রে তোর এ অবস্থা কেন—বলবি না ?

সুখেন্দু ম্লান হাসল। হেসে বলল—কি আর বলব ? একজন অস্বীকৃতিবান শিল্পীর যা অবস্থা হয় তাই হয়েছে।

—কেন কোন কাজকর্ম্ম পাচ্ছিস্ না ?

সুখেন্দু বলল—কাজ ? কি কাজ পাব বল ? কে আমাকে দিয়ে গরু, ভেড়া, ছাগল আঁকিয়ে নিয়ে ঘরের শোভা বর্দ্ধন করবে ?

ওরা কথা বলতে বলতে দুজনে চলতে সুরু করেছিল।

সামনে একটা রেষ্টুরেন্ট দেখে অসিত সুখেন্দুর হাত ধরে টানল, বলল—চল রেষ্টুরেন্টায় বসে কথা বলি।

সুখেন্দু প্রতিবাদ করবার আগেই অসিত ওকে টেনে নিয়ে রেষ্টুরেন্টটায় ঢুকল। তারপর একটু কোণ দেখে দুটো চেয়ার অধিকার করে অসিত বলল বয়কে—দু কাপ চা আর দুটো কাটলেট।

তারপর সুখেন্দুকে বলল—তারপর ?

সুখেন্দু বলল—তারপর এই পথে পথে ঘোরা আর খুঁজে বেড়ান অর্থের সন্ধান।

অসিত বলল—গরু, ভেড়া, ছাগল না এঁকে অন্য ছবিও ত আঁকতে পারতিস্ ! আজকাল পাবলিক যে রকম চায় ?

সুখেন্দু ম্লান হাসল। হেসে বলল—আজকাল পাবলিক যা চায় সে হচ্ছে নগ্ন চিত্র। আর্টের দোহাই দিয়ে এই সব নগ্ন চিত্র দেখতে পাবলিক এখন বেশী উৎসাহী।

অসিত একটু গম্ভীর হয়ে কি চিন্তা করল। তারপর বলল—পয়সার জন্যে নয় না হয় তাই আঁকলি। কি করবি বল ? পাবলিকের রুচির ওপরই ত আমাদের রুচি।

সর্প দংশন করলে যেমন মানুষ চমকে ওঠে। সুখেন্দু চমকে উঠল, বলল—তুইও এই কথা বলছিস্ ?

অসিত ম্লান হাসল, বলল—দেখ সুখেন্দু। আমি জানি কোন

মানুষের আদর্শই এমন ছোট মন পোষণ করে না। কিন্তু যখন আমরা সাধারণের মুখাপেক্ষী হয়েই আছি তখন তাদের রুচি-বোধের সঙ্গে সমতা না রক্ষা করলে তারা চাইবে কেন? আমাদের রুচিবোধের কথা তখনই ভুলতে হয় যখন আমরা চাই অর্থ। অর্থ যশঃ দেয় যারা তারাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। তাদের কথা যদি না শুনি—শাস্তি—নির্ঘাৎ মৃত্যু।

—এই আমার কথাই যদি ধরিস্। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে এখন কি হয়েছি জানিস্?

একটা সিনেমা কোম্পানীর পেণ্টার। যত সব ফিল্ম এ্যাকটর আর এ্যাকট্রেস, তাদের মুখগুলো পেণ্ট করি। আমার কি জীবনে এই আদর্শ ছিল? কিন্তু মানুষ যা ভাবে তাই কি হয়? তবু কি করব? মাস গেলে দুশ টাকা পাচ্ছি। সংসারটাও ত চলছে বেশ। সেই আমার যথেষ্ট।

অসিত থামল।

বয় অনেকক্ষণ আগে কাটলেট্ দিয়ে গিয়েছিল। সেই দিকে তাকিয়ে অসিত বলল—নে খেয়ে নে! তারপর কথা হবে আবার।

সুখেন্দু ইতস্ততঃ করে কাঁটা ছুরিটা হাতে তুলে নিল।

তারপর কিছুক্ষণ কাঁটা ছুরি আর কাটলেট নিয়ে নিরুত্তর রইল। তারপর খাওয়া শেষ হলে অসিত বলল—তুই যদি আমার কথা শুনিস্ তাহলে আমি তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

সুখেন্দু অসিতের দিকে তাকিয়ে রইল।

অসিত বলল—আমার মত তুই যদি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নিজেকে একটু অন্যভাবে ঢেলে সাজাস তাহলে পয়সাও পাবি আর তার সঙ্গে প্রতিপত্তি, যে টা তুই চাইছিস্ সেটাও পাবি।

—সেটা কি? সুখেন্দু একটু আগ্রহ প্রকাশ করল।

অসিত একটু হাসল, একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর বলল—তুই যদি কিছু মনে না করিস্ তাহলে বলি।

পটে আঁকা ছবি

সুখেন্দু বলল—মনে আর কি করব ? আজ যে পজিসন আমার এসেছে। সে পজিসনে আমি যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত।

অসিত বলল—এটা তোর রাগের উত্তর।

—না রাগ নয়। অর্থ ছাড়া যখন কোন কিছু ইচ্ছা পূরণ হয় না। তখন আমি মরীয়া। যেখানে নেমে যেতে হবে বল আমি নেমে যাব। একটুও দ্বিধা করব না।

অসিত সুখেন্দুর কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু সংযত কণ্ঠে বলল—তোর অবস্থাটা আমি বুঝতে পাচ্ছি। খুঁটিও ছাড়বি না অথচ চোর চোর খেলাও ছাড়বি না। যাক্ গে অর্থ যদি কোনদিন পাস্ ; প্রতিপত্তি ঠিকই পাবি। কারণ মানুষের অর্থ হলে মানুষ কিনতে পারে মানুষের মন। তখন নিজের প্রতিপত্তি তুই অর্থ দিয়েই কিনবি।

তারপর একটু চিন্তা করে অসিত বলল—আমার এক বিদেশী কোম্পানী জানা আছে তারা ভাল ভাল পোট্রেট ছবি কিনে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। সেই কোম্পানীর সঙ্গে আমি একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দাঁড়া। ভাল ভাল ছবি দিতে পারলে ভাল ভাল দামও তারা দেবে।

সুখেন্দু বলল—বেশ, তাই না হয় একটু দেখ। যদি রক্ষা পাই।

অসিত বলল—কিন্তু ভাল ছবি দেওয়ার ওপর ত আমার কোন হাত নেই, সেটা তোর। আমি না হয় ব্যবস্থাটা করে দিলাম। কিন্তু ভালছবি ত তোকে দিতে হবে !

সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করল—কেমন ভাল ছবি তুই বল ?

অসিত সুখেন্দুর কানে কানে কি যেন একটা বলল।

শুনেই সুখেন্দু ঝিমিয়ে পড়ল। তারপর বলল—কিন্তু পাব কোথায় ? আর তা ছাড়া সে জায়গা চাই ত। কোথায় বসে আঁকব ?

অসিত হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বলল—তুই রাজী ত! ব্যস আর তোকে কিছু করতে হবে না। এর পর আমি সব করব।

হঠাৎ অসিত উঠে দাঁড়াল তারপর বলল—আজ শুক্রবার কাল শনিবার পরশু রোববার দিন ছুপুরবেলা ছুটোর সময় তুই জানবাজারে·······নং রাণী রাসমণি রোডে আমার বাড়ীতে আয়। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখবখণ।

সুখেন্দুকে কাগজে নম্বরটা লিখে দিয়ে অসিত তার মোটা চেহারাটা নিয়ে থপ্ থপ্ করে চলে গেল।

রোববার ছুপুর ছুটো, রাণী রাসমণি রোড।

সুখেন্দুকে দেখা গেল অসিতের লেখা ঠিকানাটা নিয়ে বাড়ী খুঁজতে।

কয়েকটা খোলার বস্তি। পাশে একটা চুণ শুড়কির দোকান। এ পাশে একটা উড়ে পানের দোকান। রাস্তার ওপর কয়েকটা ঠেলাগাড়ী আর রিক্সা। তার মাঝখান দিয়ে একটা সরু গলি।

সুখেন্দু নম্বর খুঁজতে খুঁজতে সেই গলির মধ্যে ঢুকল।

গলিটা খুব বড় নয়। একটা এক প্যাসেজের গলি। সুখেন্দু নম্বর মেলাতে মেলাতে একটা একতলা সাদা বাড়ীর সামনে এসে থামল। তারপর নম্বরটা একবার অসিতের লেখা কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে বাড়ীর দরজার কড়া ধরে নাড়ল।

ছ'তিনবার কড়া নাড়বার পর দরজাটা খুলে একটী যুবতী মেয়ে মুখটা বাড়াল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করল—কাকে চান ?

—আজ্ঞে অসিত আছে ? অসিত !

—আছে। আপনি দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি। মেয়েটী চলে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডান হাতটা ভাত মাখা অবস্থায় অসিত এসে উপস্থিত।

সুখেন্দুকে দেখে অসিত বলল—এসেছিস্। খাচ্ছিলাম আমি। দাঁড়া হাতটা ধুয়ে আসি।

সুখেন্দু সপ্রতিভ হয়ে বলল—তার চেয়ে আমি একটু দাঁড়াই তুই খেয়ে আয়।

—আরে পাগল। এ রাস্তার মাঝখানে কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবি? আর তা ছাড়া আমার খেতেও একটু দেরী হয়। দেখছিস্ তো দেহটা? অসিত হাসল।—তুই ঘরে বরং একটু বস, আমি আহার পর্বটা শেষ করে আসি। এই বলে অসিত বাড়ীর ভেতর দিকে সুখেন্দুকে ডাকল।

তারপর বাড়ীর ভেতরে বাঁ দিকের একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—মিতা সুখেন্দুকে একটু ঘরে বসাও। আমি খেয়ে আসছি।

সেই মেয়েটি। প্রথমে যে দরজা খুলে দিয়েছিল। আধুনিক ধরণের ঘুরিয়ে কাপড় পরা। শ্যামাঙ্গী রঙ। সুন্দর ঢলঢলে মুখখানি, দেখলে হঠাৎ কেমন যেন আকর্ষণ আসে। ডাগর দুটি চোখ। দুটি চোখের তারা মধ্যে রাজ্যের রহস্য! কিন্তু তবু যেন কোথায় সুরকাটা। একটু যেন উদ্ধত ভাব।

মেয়েটি এসে সুখেন্দুকে ডাকল—আসুন।

সুখেন্দুকে ঘরে বসিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

সুখেন্দু চেয়ে দেখল ঘরটার চারিদিক। ঘরটা দেখলেই বোঝা যায় অসিতের ঘর। একটা ছোট একজনের শোবার মত খাট। ব্লু বেডকভার দিয়ে বিছানাটা মোড়া। সুন্দর একটি ফুলতোলা বালিশ। দেওয়ালে অসিতের একটা ফটো। দুটি মেয়ের দুখানা ষ্টিল ফটো, বাঁধিয়ে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে। সুখেন্দু দেখে চিনতে পারল। সহরের বিখ্যাত দুটি সিনেমা এ্যাকট্রেসের ফটো। ওপাশের কোণে একটা ছোট টেবিল, তার ওপরে দুখানা সস্তা ধরণের বাংলা ডিটেকটিভ বই। তার সামনে একটা মোড়া চেয়ার।

সুখেন্দু অসিতের ঘরে আঁকার কোন সরঞ্জামাদি না দেখে একটু বিস্মিত হল। অসিতকে পান চিবোতে চিবোতে

ঢুকতে দেখে বলল—তুই কি আঁকা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিস্ ?

—আঁকা ? অসিত হো হো করে এক গাল পান নিয়ে হাসতে লাগল। তারপর বলল—মানুষ যা কিছু শেখে তা সব ঐ পয়সার জন্যেই। মেয়েদের ভুরু এঁকে আর কাজল মাখিয়ে যখন পয়সা রোজগার করি তখন এঁকে আর কি হবে বল ?

—কিন্তু প্র্যাকটিস রাখা !

—প্র্যাকটিস ? একে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তায় সাফিসিয়াণ্ট পয়সা পাই না। আবার বাড়ী এসে এই সব করব ? তুই কি ক্ষেপেছিস্ ? ঐ একদিন আর্ট করতাম বলে—একটা প্রমাণ আছে আর্ট স্কুলের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট। আর কিছু আমি চাই না।

সুখেন্দু অসিতের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল—তাই বলে শিল্পী মনকে বধ করে দিলি ?

—কেন বধ করলাম কোথায় ? এখন ত মেয়েদের ভুরু আঁকি। সেটা আর্ট নয় ? আর তা ছাড়া আর্ট স্কুলে পড়ে এইটে আমার সুবিধে হয়েছে একটা কাজ পেয়েছি। জীবিকা অর্জ্জনের একটা সহজ পথ। তা না হলে তোর মত বোধ হয় পথে পথে ঘুরে শেষ হতে হত।

সুখেন্দু কিছুক্ষণ থ মেরে বসে রইল।

এই সময় সেই মেয়েটি আবার এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

তাকে দেখে অসিত তাড়াতাড়ি বলল—ওহো তুই আলাপ করবি—না ?

সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে তারপর বলল অসিত—এই হচ্ছে আমার বোন সুমিতা। তুই ত কোনদিন একে দেখিস নি সুখেন্দু ? পার্টিশন হবার পর এরা এসে মামার বাড়ীতে ছিল। ম্যাট্রিক পাশ করে টাইপ শিখে এখন একটা মার্চ্চেণ্ট অফিসের টাইপিষ্ট হয়েছে।

স্বাধীন জীবিকা আর কি। তোর কথা আমার মুখে অনেকবার শুনেছে। আজকে তুই এসেছিস শুনে আর থাকতে পারল না।

সুখেন্দু হাত তুলে নমস্কার করল।

সুমিতাও করল।

অসিত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল—আরে করিস্ কি? আমার বোন যে রে। ওকে আবার নমস্কার কি? তোর দেখছি·······!

সুখেন্দু হাসল, বলল—তা হোক্, মেয়েদের নমস্কার জানাতে হয় সর্ব্বক্ষেত্রে।

সুমিতা মুখে মৃদু হাসির রেখা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কড়াটা ধরে।

অসিত জিজ্ঞাসা করল হঠাৎ আফশোষের সুরে—এ হে রে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। তুই খেয়ে এসেছিস্?

সুখেন্দু হাসল অসিতের আফশোষ দেখে। তারপর বলল—তবু যা হোক জিজ্ঞাসা করলি। আমি ত ভাবলুম বুঝি সে ভদ্রতাও তুই ভুলে গেছিস্?

অসিত আকাশ ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর হাসতে হাসতে বলল—তুই এইবার দেখছি আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছিস্? আর বলিস কেন? সিনেমা কোম্পানীতে কাজ করে কি আর ভদ্রতা রাখতে পারি? কেবল চিটিং আর ফোর টুইন্টি। তা যাক্‌গে—পান খাবি?

সুখেন্দু মাথা নাড়ল।

—জল!

—তুই একটা কিছু না খাইয়ে দেখছি ছাড়বি না? আচ্ছা এক গ্লাস জল না হয় আনতে দে।

সুমিতা চলে গেল।

অসিত সুখেন্দুর কাছে এগিয়ে এসে একটু নিম্নস্বরে বলল—তুই

এলি তোর সব আঁকার সরঞ্জাম সঙ্গে আনতে পারলি না ? আমি এদিকে ব্যবস্থা করে এসেছি। এই ঘরটা আমার ঘর। আজ বিকেল চারটের সময় একটী মেয়ে আসবে। তুই ঘরের দরজা বন্ধ করে তার ছবি আঁকবি! আর যখন যা দরকার হবে সুমিতার কাছে চেয়ে নিবি। অবশ্য যখন ও থাকবে। তা না হলে মা ভাইরাও ত রয়েছে।

সুখেন্দু ভয়ে ভয়ে বলল—তোর বাড়ীতে কোন অবজেকসন্ হবে না ত ?

অসিত হাসল, বলল—জানিস্ আমি এ বাড়ীর হেড। যা ব্যবস্থা করব তাই হবে।

—কিন্তু সেই যে মেয়েটা আসবে সে তার ছবি আঁকতে দেবে কেন ?

অসিত হাসল, হেসে বলল—তুই সত্যিই এখনও ছেলেমানুষ সুখেন্দু ! তাকে টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করে এসেছি, একেবারে কড়কড়ে পাঁচটা দিয়ে। কাজের আগে নগদ পাঁচটা মুদ্রা। ছবিটা কিন্তু বেশ একটু......। এই বলে অসিত একটা চোখ একটু অদ্ভুতভাবে মচকাল।

সুখেন্দুর চোখে তবু প্রশ্ন। বলল—পাঁচটাকায় সে রাজী হল ?

—তুই দেখছি জ্বালালি সুখেন্দু ? তুই কি জানিস না। মেয়েরা আর্টিষ্টদের মডেল হয় ?

সুখেন্দু হাসল, বলল—জানি। তবে চাক্ষুস দেখিনি ত সেইজন্যে কেমন বেখাপ্পা লাগছে।

এই সময় সুমিতা এক গ্লাস জল নিয়ে এল।

সুখেন্দু জলটা এক চুমুকে নিঃশেষ করবার পর অসিত বলল—তাহলে তুই তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যা। গিয়ে একটা রিক্সা করে তোর আঁকার সরঞ্জামগুলো নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করেনি। দেখিস্ বেশী দেরী করিস্ না। ছবিটা যদি

সাতদিনে শেষ করতে পারিস দু'শ টাকা পারিশ্রমিক আমি সেই রকম কথাই ওদের সঙ্গে বলে এসেছি।

সুখেন্দু বেরিয়ে গেল।

বিকেলবেলা।

সুখেন্দু আর অসিত অসিতের ঘরে বসে। বসে বসে তারা চা খাচ্ছিল।

হঠাৎ বাইরের দরজার কড়া নড়তে তাড়াতাড়ি অসিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েকমিনিট পরে একটী মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

সুখেন্দু তাকিয়ে দেখল। সুমিতার মত বয়সীই একটী মেয়ে। সুমিতার মতই গায়ের রঙ—শ্যামাঙ্গী। মুখ চোখ মন্দ নয়। একটা সাধারণ কাপড়; সাধারণভাবেই পরে এসেছে।

অসিত মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—এই ইনি আর্টিষ্ট সুখেন্দু বোস।

আর এনার নাম—বিনতা; বিনতা চ্যাটার্জী।

বিনতা নমস্কার করল।

তারপর অসিত জিজ্ঞাসা করল বিনতাকে—পথে আসতে আপনার কষ্ট হয়নি ত!

বিনতা বলল—নম্বর রয়েছে কষ্ট হবে কেন? আন্দাজে খুঁজতে খুঁজতেই পেয়ে গেলাম।

অসিত বলল সুখেন্দুকে—তাহলে তোর আঁকার সরঞ্জামগুলো ঠিক করে নে। আমি ততক্ষণ এনাকে একটা ট্রেনিং দিয়ে নিই।

অসিত বিনতাকে বোঝাতে লাগল—ছবিটা আঁকা হবে ঠিক এই রকম একটা চরিত্র সৃষ্টি করে। পাড়াগাঁয়ের একটা মেয়ে।

গায়ে কোন জামা নেই। শুধু একটা কাপড় দিয়ে নিজের লজ্জাটাকে ঢেকেছে। চেয়ে আছে উদাস দৃষ্টিতে। কোনদিকে তার খেয়াল নেই। বুকের আঁচলটা খসে যাচ্ছে আপনা হতে।

সুখেন্দু অসিতের কথাগুলো শুনে মাথাটা একটু নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল। বুঝতে পাচ্ছিল অসিত। কিন্তু সে খুব গ্রাহ্য করল না। সে তখন বিনতাকে চরিত্রটা বুঝিয়ে চলেছে। চরিত্রটা বুঝিয়ে অসিত জিজ্ঞাসা করল বিনতাকে—পারবেন ত ?

বিনতা হাসল, বলল—পারব না কেন ? এ আর এমন কি ?

অসিত সুখেন্দুর ঝুঁকে পরা দেহটার দিকে চেয়ে মনে মনে একটু হাসল। সুখেন্দু কার্ডবোর্ড লাগাছে ত লাগাচ্ছেই। অসিত একটু গলাটা চড়িয়ে দিল—কি হে আর্টিষ্ট ? তোর কি এখনও হয়নি ? আজ একটা পেনসিল স্কেচও না হয় করে নে ?

সুখেন্দুর তবু কোন সাড়া নেই। তার মাথাটা যেন আরও ঝুঁকে পড়তে লাগল।

শেষকালে অসিত গিয়ে গায়ে ঠেলা দিল—কিরে তাড়াতাড়ি নে! আজ অন্তত পেনসিল স্কেচটাও ফিনিস কর ?

সুখেন্দু তাকাল, মুখটা ওর আরক্ত। বলল একটু চাপাস্বরে—একটু বাইরে যাবি আমার একটা কথা আছে !

—কথা ! কি কথা ?

—আছে, একটু চ না বাইরে !

অসিত বেরিয়ে এল সুখেন্দুকে নিয়ে বাইরে।

বাইরে এসে সুখেন্দু অসিতের হাতটা চেপে ধরল। বলল কাতর স্বরে—আমি পারব না অসিত। এ ছবি আমার দ্বারা আঁকা সম্ভব হবে না। আমার হাত কাঁপবে।

—হাত কাঁপবে ? অসিত বিস্মিত হল।

—হ্যাঁ, আমি এ রকম ছবি আঁকার প্রত্যাশা কোনদিন করিনি। তুই ওকে আর পাঁচটা টাকা দিয়ে বিদায় করে দে। আমি তোকে

দশটা টাকা যেমন করে হোক দিয়ে যাব। তবু তুই আমাকে এ রকম ছবি আঁকতে অনুরোধ করিস্ নি।

অসিত সুখেন্দুর কথা শুনে বিশেষ কিছু মনে করল না। শুধু একটু চিন্তা করে বলল—আমি বুঝতে পেরেছি তুই এই রকম একটা কিছু বলবি। কিন্তু আমি ওকে তাড়িয়ে দেব বলে ত আর এত কষ্ট করে নিয়ে আসি নি! তোকে ওর ছবি আঁকতেই হবে। আমি সেই কোম্পানীকে কথা দিয়ে এসেছি। এক সপ্তাহ পরে ছবি দেব। আর তার দরুণ তারাও আমাকে পঞ্চাশটা টাকা এডভান্স দিয়েছে। এই নে পঞ্চাশটা টাকা। এই বলে অসিত পকেট থেকে পাঁচটা দশ টাকার নোট সুখেন্দুর হাতে দিল।

হাতে টাকা, ঘরে মেয়ে, সামনে অসিত। সব কটাকে উপেক্ষা করলে তার বিপরীত অর্থ মৃত্যু। সুখেন্দু একবার থমকে দাঁড়াল, ভাবল। কিন্তু কিছুতে নিজেকে মানিয়ে তুলতে পারল না। বলল সুখেন্দু কাতর স্বরে—না অসিত আমি পারব না। তুই আমাকে ক্ষমা কর। যা কোনদিন ভাবি নি তাই আজ আমি কিছুতে করতে পারব না।

হঠাৎ অসিত রেগে উঠল, বলল—একটা ছেলে মানুষী করার সীমা আছে! এই এত আয়োজন, এত কিছু! সব ছাই হয়ে যাবে। তুই না পুরুষ—সুখেন্দু! তোর সামনে দেখলি একটা মেয়ে দশটা টাকার বিনিময়ে সে তার লজ্জা ত্যাগ করছে! আর তুই এটা এঁকে পরিবেশন করতে পারবি না? এখন দেখছি ঐ মেয়েটার যা বুদ্ধি আছে তোরও তা নেই। ও জানে টাকাটাই সব, লজ্জাটা সব নয়। ইজ্জত দিলেও বেচে থাকা যায়। আজকের বড় প্রশ্ন শুধু টাকা। সুখেন্দু তুই আর একবার ভেবে দেখ। যদি এ সুযোগ তুই হারাস তাহলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। শুধু তোর একার মৃত্যু নয় তোর সমস্ত পরিবারের মৃত্যু।

সুখেন্দু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আরক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

তারপর অনেকক্ষণ ভাবল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ব্রততীর কথাটা মনে পড়ল। ব্রততী আজ তাকে উপেক্ষা করে। সুখেন্দু ম্রিয়মাণ হয়ে বলল্—বেশ, আঁকব আমি। ঘরে চল।

ওরা আবার ঘরে ঢুকল।

তারপর প্রত্যহ অসিতের ঘরে আঁকা চলতে লাগল। সুখেন্দু বারটায় আসে। বিনতাও আসে। শুধু অসিত থাকে না। তার সিনেমায় কাজ। রোজ বারটাতেই বেরিয়ে যায়। সুমিতাও থাকে না; সেও দশটায় অফিসে চলে যায়। শুধু থাকে অসিতের মা, দুটো ছোট ভাই—নিমাই আর বলাই আর একটা ছোট বোন রীতা। অসিতের বাবা অনেক দিন আগে গত হয়েছিলেন। জল টল কিছু দরকার হলে অধিকাংশ সময় রীতাই সরবরাহ করে যায়। এটা অসিতেরই হুকুম।

সেদিন কিসের একটা ছুটীর বার ছিল। হঠাৎ বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে সুখেন্দু অসিতের গলা পেল। অসিত চীৎকার করছে। বেশ চড়া সুর।

—তখনই বলেছিলাম চাকরী করিস্ না। মেয়েদের চাকরী করা মানে সর্ব্বনাশকে ডেকে নিয়ে আসা। না, স্বাধীন জীবিকা। তখন বক্তিমে। এখন কি হবে? এখন কে এসব সামলাবে? শেষকালে এক শাদা সাহেবের হাতে প্রাণটা দিলি। এখন এই কালা মুখ নিয়ে কোথায় যাই! অসিতের গলা ধরে এল।

অসিতের মায়ের গলা। চাপা স্বর—আঃ খোকা একটু আস্তে বল না। আশে পাশের লোক যে শুনতে পাবে!

অসিত উলটো বুঝল। আরও চীৎকার করে বললে—শুনতে পাবে ত হবে কি? আমি ওসব কেয়ার করি? আসুক না কেউ বলতে আমাকে কিছু। শোনাবার আমার ক্ষমতা আছে! আমার ঘরে আমি যা খুসী করব তাতে পাড়ার লোকের কি?

সদর দরজার একটা পাল্লা ধরে সুখেন্দু বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল—তবে কি সুমিতার কথা নিয়ে অসিত চীৎকার করছে? সেও কি ব্রততীর মত তার দাদাকে উপেক্ষা করতে সুরু করেছে? না, তাই বা কেমন করে হয়? অসিতও ত উপার্জ্জন করে। সে কেন তার মত ছোট বোনের অর্থে উদর পূরণ করবে!

হঠাৎ অসিত সুখেন্দুকে দেখতে পেল, ডাকল—আয়, ঘরে আয় সুখেন্দু।

সুখেন্দু যন্ত্র চালিতের মত ঘরে গিয়েই উপস্থিত হল।

অসিত কোন ভূমিকা না করেই সুরু করল—দেখ্না আর এক মস্ত ঝামেলায় পড়ে গেলুম! বোনটী এক অঘটন ঘটিয়ে বসে আছে। তখনই বললাম—তোকে চাকরী করতে হবে না। ওরে মেয়েদের চাকরী করা এখনও আমাদের দেশে ঠিক ভালভাবে সহজ হয়ে ওঠে নি। চাকরী করতে যাবি, মৌচাকের মত ভীড় এসে ছেঁকে ধরবে! তাদের কাটিয়ে নিজেকে ঠিক রাখা সে আমাদের দেশের মেয়েদের কর্ম্ম নয়। হাতটা ধরলেই অমনি লজ্জাবতী লতার মত এলিয়ে পড়বে। আর লম্পট পুরুষরা........।

বর্ত্তমান যুগের দিকে তাকিয়ে বোনটাকে তাই নিষেধ করেছিলাম। ও ভাবল—দাদা তার চাকরী করতে দিতে চায় না, কারণ মেয়েদের অর্থ নিয়ে অপমানিত হতে হবে বলে। আরে বাপু ওসব সেন্টিমেণ্টালের মত মন আমার নয়।

তাও যখন এরকম চলছে। একদিন আমাকে বল। তা নয় চুপ চুপ করে রেখে অবস্থাটা পাকিয়ে মাকে এসে বলা হল। প্রথম প্রথম বললে না হয় একটা ব্যবস্থা করা যেত। আজকাল বিজ্ঞানের যুগে অভাব-ত কিছুই নেই, একটা কিছু ব্যবস্থা করে এটা বন্ধ করে দিতাম। তা নয় পাছে বললে আমি অন্য কিছু ব্যবস্থা করি তাই আমাকে কিছু বলেনি।

মাসখানেক আগে মাকে তখনই বলেছিলাম—মা মিতাটাকে লক্ষ্য করেছ? ও যেন কেমন হয়ে গেছে।

মা উড়িয়ে দিলেন, বললেন—হবে আবার কি? মেয়েদের বিয়ের বয়স হলে ঐ রকম হয়। তুই ত একটা ছেলে ঠেলে দেখবি না!

তখন যদি মা জিজ্ঞাসা করতেন। ইস্—। একটা অসোয়াস্তিতে অসিত পায়চারী করতে লাগল। এখন আমি কি করি? একবার ডাঃ সোমের কাছে যাই তার সাজেসনটা নিই।

সুখেন্দু এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। আর ভাবছিল ব্রততীর কথাটা। তবে কি ব্রততীর অবস্থাও এরকম হয়েছে? সেও ত তাকে এড়িয়ে যায়। সেও ত আর কাছে এসে তাকে উৎসাহ দেয় না। অথচ টাকা আনছে বাড়ীতে প্রচুর। খাওয়া দাওয়াও হচ্ছে ভাল। জামা কাপড়ও মন্দ নয়। মা বাবার মুখেও কি হাসি। ব্রত ঠিক উপযুক্ত ছেলের মতই কাজ করছে। মেয়ে যদি ছেলের মত কাজ করে তবে ছেলেতে আর কি দরকার! এই ত সব কুলাঙ্গার ছেলের দল। একজন বিয়ে করে বাড়ী ছাড়ল। একজন আর্ট নিয়ে মাথা ফাটাচ্ছে, পয়সা আনবার একটা মুরোদ নেই।

সুখেন্দু ব্যাপারটা সব বলল অসিতকে।

অসিত শুনেই খানিকটা থ। বলল—বলিস্ কি রে? তোরও বাড়ীতে এই! আর আজকালকার হয়েছে মেয়েদের চাকরী করা। একি বাবা অন্য দেশ যে মেয়েরা নিরাপদে পথ চলবে? এখনও বাসে ট্রামে উঠলে মেয়েদের আলাদা সীট দিতে হয়? তারা চাকরী করবে শুনলে সেইজন্যেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এখনও এমন অনেক অফিস আছে, যে অফিসে লেডী কেরাণী একেবারেই এলাও হয় না। কারণ মেয়েরা অফিসে ঢুকলে একটা বিপ্লব হবেই। ছোক্‌রা কেরাণীরা কাজ করবে না। কেবল মিস বা মিসেসের পাশে ঘুর ঘুর করবে। আলাপ করবে সঙ্গে করে নিয়ে রেষ্টুরেন্টে যাবার চেষ্টা করবে। এমনকি পরে বিয়ের প্রস্তাবও শোনাবে।

রিফিউজ হলে রাগ। তাহলে বল এই ঝুঁকি নিয়ে কি করে মেয়েরা কাজ করবে ?

অথচ দিন দিন মেয়েরা যে রকম শিক্ষিত হয়ে উঠছে তাতে তাদের আর এ সব বুঝিয়েও চুপ করে রাখা যাবে না। শিক্ষিত মন সব। যদি শিক্ষাটাকে কাজে না লাগাতে পারল তাহলে তাদের শিক্ষা পেয়ে লাভ কি ? এম, এ, বি,-এ পাশ করে যদি সেই রান্নাঘরে ঢুকতে হয় তাহলে তাদের মূল্য কি রইল ?

বড় চিন্তার ব্যাপার সুখেন্দু, বড় চিন্তার ব্যাপার।

আমিও প্রতিবাদ করেছিলাম। সুমিতা যখন চাকরী করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার কাছ থেকে আমি এই জবাবই পেয়েছিলুম।" —শিক্ষিত হয়ে শেষকালে অকেজো হয়ে ঘরে বসে থাকব ? তুমি এতখানি ছোট মনের পরিচয় দাও দাদা ? কিন্তু আমি কেন প্রতিবাদ করেছিলাম হাড়ে হাড়ে বোনটি এখন বুঝতে পারছে।

টমাস কেলি ম্যানেজার তার প্রাইভেট সেক্রেটারী। মাসে তুশ টাকা মাইনে। শুনেই আমার মনটা তখনই কেমন করে উঠেছিল। আজ সেই টমাস কেলিই তার সর্ব্বনাশ করল।

সুখেন্দু বসে বসে কিন্তু অসিতের কথা একটিও শুনছিল না। সে তখন ভাবছিল ব্রততীর কথা। যদি ব্রততীও এমনি ফাঁদে পড়ে থাকে! তাহলে! তাহলে তাকে সে রক্ষা করবে কেমন করে ? মা বাবা ত এবিষয়ে কিছুই করবেন না। বরং এরকম একটা অঘটন ঘটেছে শুনলে তার ওপরই দোষারূপ করবেন। "উপযুক্ত ছেলে হয়ে সে যখন বাড়ীর সম্বন্ধে উদাসীন, তখন এমন হবে এ আর বিচিত্র কি ?" আর আরও রেগে উঠবেন—ব্রততী কাজ ছেড়ে দিলে।

সুখেন্দু উঠে দাঁড়াল। তারপর অসিতকে বলল—অসিত আমি একবার বাড়ী যাচ্ছি। আজ আর আসব না। বিনতা এলে তাকে চলে যেতে বলিস। কাল আবার আসব।

অসিত বুঝতে পারছিল সুখেন্দুর অবস্থাটা। তাই বলল—আচ্ছা তুই যা, আমি ব্যবস্থা করবক্ষণ। ছবিটাত আর একদিন হলেই শেষ হয়ে যাবে। একদিন আর কোনরকমে বসিস তাহলেই হয়ে। তোরও ত টাকার দরকার।

সুখেন্দু বাড়া চলে এল।

বাড়ীতে এসে সে প্রথমেই খুঁজল ব্রততীকে। কিন্তু ব্রততী তখনও ফেরেনি। ছোট একটা ভাই বলল—দাদা দিদি ত আজকাল রাত্রি না হলে ফেরে না।

এ খবরও সুখেন্দু জানত না। অবাক হয়ে তাই ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিরকম যেন একটা সব খাপছাড়া। ব্রততী উপেক্ষা করছে দেখে সে ব্রততা সম্বন্ধে সব খোঁজ দেওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল। ব্রততা আজকাল অনেক রাত্রে ফেরে শুনে তাই একটু অবাক হয়ে গেল। ভাইকে পরে অস্ফুষ্ট স্বরে বলল—ও, সে বুঝি অনেকরাত্রে ফেরে? আচ্ছা ফিরলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্।

সত্যি ব্রততী অনেক রাত্রেই ফিরত। এ ছাড়া তার আর উপায়ও ছিল না। অনেক রাত্রে না ফিরলে বাড়ীতে সে নিজেকে সবার মধ্যে থেকে লুকিয়ে রাখতে পারত না। বিশেষ করে সুখেন্দু—তার প্রিয়তম দাদা।

আর, আর একটা কারণ দেরী হত রতিকান্তের জন্যে। সে কারখানার হিসেব পত্তর শেষ না হলে বেরুত না! আর তাছাড়া আজকাল ব্রততীকে একটু এড়িয়েই চলত রতিকান্ত। ব্রততীর একই ধরণের কাঁদুনী আর তার ভাল লাগত না। কেন আর লাগবে? এখন ব্রততীকে কোন রকমে তাড়াতে পারলেই বরং বাঁচোয়া। ব্রততীর সেই একই ধরণের প্রশ্ন—কিছু করলে? আমি যে দুদিন পরে আর কারও সামনে মুখ দেখাতে পারব না।

রতিকান্ত তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করে—হ্যাঁ এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম সে বলেছে একটা ওষুধ লিখে দেবে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সে ডাক্তারের ওষুধ আর আসে না আর ব্রততীর কাঁদুনিও আর শেষ হয় না। শুধু রতিকান্তই বিরক্ত হয়। মনে মনে বলে—এ এক ঝামেলা। একসময় বিরক্ত হয়েই বলে—তোমার এ অবস্থার জন্যে আমি ত দায়ী। বেশ কত টাকা হলে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাব বল—আমি দিয়ে দেব!

ব্রততী সর্পিনীর মত ফনা তোলে। বলে—টাকা? শুধু টাকা দিয়ে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও?

রতিকান্ত হাসে, বলে—আর এছাড়া কি চাও?

—চাই? আমার এ সর্ব্বনাশ করে তুমি এখন এই কথাই জিজ্ঞাসা করছ! তোমার কি সত্যি টাকা দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই! যে সন্তান আমার গর্ভে আসছে তার কি ব্যবস্থা করছ?

রতিকান্ত তবু নিলর্জ্জের মত হাসতে থাকে। তারপর বলে—সে আমি কি জানি। তুমি রাখতে হয় রেখে দিও নয়ত হবার পর গলা টিপে মেরে ফেল!

—জীব হত্যা? ব্রততী শিউরে ওঠে।—এ কথা তুমি বলতে পারলে?

রতিকান্ত বলে—কেন কি আর এমন অন্যায় কথা হল? সন্তানের বাবা যখন তার সন্তানকে অস্বীকার করছে তখন সে সন্তান আর জন্মগ্রহণ করে কি করবে?

—তাই বলে হত্যা?

—হত্যা কেন? বিলিয়ে দিতে পার।

ব্রততী হঠাৎ একটু কাতর হয়ে ওঠে—তুমি কি এ অবস্থাটা পরিবর্ত্তন করতে পার না?

রতিকান্ত বলে—কি করে আর পরিবর্ত্তন করব বল? তুমি যে এত শীগ্রি অন্তসত্বা হবে—কে ভেবেছিল?

ব্রততী বলে—একটা ব্যবস্থা যদি তুমি মেনে নাও তাহলে সব দিকটাই রক্ষা হয়ে যায়। তুমি আমাকে বিয়ে কর।

রতিকান্ত হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে, তারপর বলে—আমি এই সাঁইত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কুমার নামটা বাঁচিয়ে আসছি—তুমি কি সেটা ঘুচিয়ে দিতে চাও?

আর সহ্য করা যায় না। ধৈর্য্যের বাঁধ আর থাকে না। পাষানও বুঝি বা গলে যায়। কিন্তু তবু ব্রততী নিজেকে সংযত করে রাখবার চেষ্টা করল।

একদিন নয় এ রকম দিনের পর দিন চলছে। একই কথার পুনরাবৃত্তি প্রতিদিন চলছে। আর জবাব সেই একই।

ব্রততী তবু ছাড়ে না। রতিকান্ত তাকে তাড়িয়ে দেবার বহু চেষ্টা করছে ও বুঝতে পারছে। তবু যেন বুঝেও না বোঝার মত। ইজ্জত চলে গেল। নারীত্ব পদদলিত হল। এখন লাঞ্ছনা আর অত্যাচার।

ব্রততী যেন পাগল হয়ে উঠেছে। দিনের পর দিন সে রতিকান্তকে অনুরোধ করে চলেছে—তুমি আমায় বিয়ে কর।

কিন্তু সত্যিই কি ব্রততী রতিকান্তকে বিয়ে করতে চায়?

হয়ত উত্তরও—হ্যাঁ।

কারণ ব্রততী আগেই জানত এ রকম বিপদের সম্মুখীন তাকে একদিন হতেই হবে। সেদিন বাঁচার পথ তার রুদ্ধ থাকবে। সেদিন শুধু মৃত্যু। এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে যদি নিজের সত্বাকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারল তাহলে সে বাঁচা কি? আজ ব্রততী রতিকান্তকে বিয়ে করতে চায় কারণ, তার গর্ভে যে ছেলে আছে সে ছেলের ওপর তার একটু স্নেহভাব। ব্রততী জানে রতিকান্ত বিয়ে করবে না। রতিকান্ত যে কোন শ্রেণীর জীব ব্রততীর জানতে বাকী ছিল না। একদিন জেনে-শুনে হাড়ি-কাঠে মাথা গলিয়ে দিয়েছিল শুধু এইজন্যে যে নিজের জীবন

দিয়ে ত তাদের পরিবারটাকে বাঁচাতে পারবে। পরিবার বেঁচেছে। তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। শুধু সে শেষ হয়ে গেছে। এখন তাই ব্রততী মরীয়া। ব্রততী ত এবার আত্মহত্যা করবেই! সঙ্কল্প তার মনে মনে তাইই আছে। কিন্তু রতিকান্তের মনুষ্যত্বটা শেষ পর্য্যন্ত একবার দেখতে চায়। চাই কি মরবার আগে সে যদি পারে এই রকম একটা নারীলুণ্ঠনকারী দুশ্চরিত্রকে পৃথিবীতে সরিয়ে দিতে—সে মনে মনে সেই চেষ্টা করছে।

তবু অনুরোধ করে ব্রততী—আমায় তুমি বিয়ে করবে না?

রতিকান্তর সেই হেসে উত্তর—তুমি কি আমার কুমার নামটা ঘোচাতে চাও?

ব্রততী দাঁত দিয়ে শুধু নিজের ঠোঁটটা জোরে চেপে ধরে।

কুমার? রতিকান্ত কুমার নামটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আগুনের ভেতর ব্রততীকে ঠেলে দিচ্ছে। আশ্চর্য্য, বিবেকে কি একবারও বাঁধে না? একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করে নিজেএ মনভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে—এ খুব বহু অভ্যস্ত মন না হলে পারে না। ব্রততী যে রতিকান্তর জীবনে প্রথম ও শেষ নয়—এ অবশ্য তার পরিচয় থেকেই জানা আছে। তবু মনে হয় ব্রততী স্বতন্ত্র রতিকান্তর জীবনে। ঠিক কাজ হাসিল হয়ে গেলে যে তাচ্ছিল্যের ভাব রতিকান্তর আসতে পার ত; ব্রততীর বেলা সেটা আসে না। ব্রততীকে সে উপেক্ষা করে কিন্তু মনে মনে দারুণ ভয়ও করে।

একদিন ব্রততী রেগে উঠে বলেওছিল—জানো, মেয়েরা মরীয়া হয়ে উঠলে খুন করতেও দ্বিধা করে না? তুমি যদি কোন সুব্যবস্থা না কর তাহলে আমাকে বোধ হয় তাইই করতে হবে।

—খুন? এ্যাঁ! বল কি? রতিকান্ত একটু যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

ব্রততী মনে মনে সত্যিই ঠিক করে রেখেছে—রতিকান্ত যদি তাকে বাঁচানর কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেও রতিকান্তকে এ

জগতে বাঁচতে দেবে না। যেমন করেই হোক রতিকান্তকে সে মারবে। বেঁচে থেকে আবার ও মেয়েদের নিয়ে খেলবে—সে কিছুতেই হবে না।

ব্রততী শেষ সঙ্কল্প একই আছে। কিন্তু তবু সে এক একবার রতিকান্তকে অনুরোধ করে, সে শুধু রতিকান্তকে পরীক্ষা করবার জন্যে।

এমনি চলছিল দিনের পর দিন।

সেদিনও ব্রততী অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে চুপি সাড়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকছিল। সামনের প্যাসেজটা অন্ধকার। তারপরেই সুখেন্দুর ছোট একফালি ঘরটা। কোন রকমে পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু হঠাৎ কার যেন গলার গম্ভীর ডাক।

—ব্রত!

ব্রততীর পা দুটো কে লাগাম দিয়ে যেন আটকে দিল। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চেয়ে দেখল অন্ধকার ভেদ করে সুখেন্দুর সেই ছোট্ট ঘরটার দিকে। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না ব্রততী। সব অন্ধকার। অন্ধকার ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। ব্রততী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। কি করবে? চলে যাবে না ডাকটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাবে! হঠাৎ আবার চিন্তাজ্জাল ছিন্ন করে গম্ভীর কণ্ঠ—

—ব্রত ভেতরে আয়, কথা আছে।

ব্রততী যন্ত্রবৎ চালিতর মত নিঃশব্দে সেই অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলল। সামনে সুখেন্দুর ঘর। ঘরের মধ্যে একটা দু'পয়সা-ওয়ালা মোমবাতি জ্বালিয়ে সুখেন্দু অমিতার মায়ের ছবিটার ওপর তুলি বোলাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে আলো আছে, বাইরে থেকে কিন্তু তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল না।

ব্রততী সেই ছোট্ট ঘরটার চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল।

সুখেন্দু অনেকদিন পরে আজ বোনের দিকে ভাল করে তাকাল।

আবছা আবছা আলোর জ্যোতি, হাওয়ায় শিখাটা কাঁপছে সেই কাঁপানো শিখার আলোয় সুখেন্দু যা দেখল তাতে না চমকে পারল না।

শুধু নিঃশব্দে সুখেন্দু ব্রততীর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে অস্ফুষ্টস্বরে বলল—বস। এই বলে সুখেন্দু অনেকদিন পরে নিজের পাশের জায়গাটা বোনকে দেখিয়ে ছিল।

ব্রততীও দাদার দিকে অবাক বিস্ময় মাখানো কাতর চোখে তাকিয়ে ছিল। হৃদয় আজ যেন তার ভেঙ্গে পড়ার যোগাড়। অনেককাল, অনেককাল পরে ব্রততী আজ যেন সব ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে বুঝি!

তার কেউ নেই, ছিল তার দাদা। দাদা তাকে ভাল বাসত, দাদাকে সে ভালবাসত। অথচ এই কমাস ধরে দাদার সামনেই তার আসতে কেমন যেন লজ্জা করেছে। শুধু ভয়! যখন দাদা তার দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারবে, যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন কি সে উত্তর দেবে? বলবে—তোমাকে বাঁচাতে নিজের পরিবারকে বাঁচাতে আমি আত্মবলি দিয়েছি। দাদা হয়ত বিশ্বাস করবে! কিন্তু সে কি করে দাদার সামনে দাঁড়িয়ে আর নিজেকে ধরে রাখবে? হয়ত এতদিনের যত বাঁধ যত সহনশীলতা সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে দাদার কাছে লুটিয়ে পড়বে। আর ভগ্নী হারানর নির্ম্মম ব্যথা নিয়ে দাদা তার সৃষ্টিকে ভুলে যাবে। যে সৃষ্টিকে বাঁচাতে, যে পরিবারকে অনাহার থেকে বাঁচাতে তার এত স্বার্থত্যাগ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দাদা তার পাগল হয়ে যাবে।

সেইজন্যে সে বাড়ীর সবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দাদার সামনে সে দাঁড়ায় নি। দাদা তার ঠিক ধরে ফেলবে—বোনের পতনের ইতিহাস। যত গোপনই রাখবার চেষ্টা করুক সে—মনের বিকার মুখে প্রতিফলিত হবেই। আর যখন জানতে পারবে সব তখন ···। আর ভাবতে পারে নি ব্রততী। তাই অনেক রাত্রি

হলে ব্রততী ফিরত, সকাল হলে আটটার সময় তার কারখানায় যাবার কথা, তার আগেই সে পালিয়ে যেত। সূর্য্যকে তার ভয় নেই, দাদাকে তার ভয়। সূর্য্যের সামনে সে চোখ মেলে তাকিয়ে লজ্জাবোধ করে না, করে সুখেন্দুকে। এ কলঙ্কিনী মুখ প্রিয়তম দাদার কাছে আর যেন সেই আগের মত তুলে ধরা যায় না।

ব্রততী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুখেন্দুর পাশে বসল।

সুখেন্দুর তখনও চোখের দৃষ্টি ব্রততীর ওপর। সে দেখছিল আর ভাবছিল এক বাড়ীতে তুজনে বাস করি অথচ কতদিন আমাদের অদেখা! সুখেন্দু দেখছিল আর বিস্মিত হয়ে উঠছিল—এত পরিবর্ত্তন! মানুষের এই কদিনে এত পরিবর্ত্তন হয়ে যায়—সুখেন্দু কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ল।

ব্রততীর মুখের কোন জায়গায় রক্ত নেই। কে যেন সব এক চুমুকে নিঃশেষ করে নিয়েছে। শুধু হলদে মুখ, আলোহীন ঘরেও দেখতে এতটুকু ভুল হয় না। চোখ তুটো কে যেন জোর করে পাতাল গহ্বরে নামিয়ে দিয়েছে।

সুখেন্দু ভাবতে লাগল—এরই ওপর এতদিন অভিমান করে সে দূরে দূরে ছিল। ভেবেছিল ব্রততী তাকে উপেক্ষা করছে। আশ্চর্য্য, মানুষ ভুল বুঝে এমন বিপরীত চিন্তা করে।

আজ ব্রততীকে দেখে তার সব চিন্তাই পথ পরিবর্ত্তন করছে। এ রকম রূপ যে ব্রততীর দেখবে—সে আশা করে নি।

তুজনেই পাশাপাশি বসে, কারও মুখে কথা নেই। অনেক দিনের পর তুজনে এক জায়গায় মিলেছে দেখে তুজনাই নির্ব্বাক হয়ে গেছে। অনেক কথা, অনেক অভিমান, অনেক কৈফিয়ৎ সব যেন কণ্ঠের কাছে এসে হুড়োহুড়ি করছে। কে আগে বেরুবে ঠিক করতে না পেরে সবাই কণ্ঠের মুখের কাছে আটকে গেছে।

অনেক পরে নিজেকে সংযত করে ব্রততী বলল—দাদা কিছু বলবে?

বলবে? বলার কি আর শেষ আছে? অনেক কথা যে কণ্ঠের কাছে এসে ভীড় করে সুখেন্দুকে সংযত করে দিয়েছে। সুখেন্দু বলবে। অনেক কিছু বলবে। আর বলার জন্যেই ত সে ডেকে এনেছে ব্রততীকে তার ঘরে এই রাত্রে। কিন্তু অনেক কাছে পেয়েও যেন কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। এমন কি কিছু জিজ্ঞাসা করতেও যেন সুখেন্দুর আতঙ্ক জাগে। যদি তাই হয়? সে যা অনুমান করেছে ব্রততীর জীবনে যদি তাই ঘটে থাকে? অসিতের বোন সুমিতার আজ যে অবস্থা হয়েছে। কে এক টমাস সাহেবের মত ব্রততীকেও যদি কেউ ....। আর ভাবা যায় না। ভাবনা যে এমন আতঙ্ক নিয়ে আসে এই প্রথম সুখেন্দু বুঝতে পারল।

অনেকক্ষণ পরে সুখেন্দুর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল—তোর কি আজকাল রোজই এমন দেরী হয়?

ব্রততী মাথা নীচু করে ডান পায়ের নখটা একমনে খুঁটছিল। উত্তর দিল—হাঁ।

—আজকাল বুঝি বেশী আলু ছাড়াতে হয়?

ব্রততী উত্তর দিল না।

সুখেন্দু বোনের দিকে আর একবার তাকাল। তারপর সুমিষ্ট স্বরে বলল—আমি ডেকেছি তোকে এসব জিজ্ঞাসা করবার জন্যে নয়। জিজ্ঞাসা করছি তোর আজ একি অবস্থা হয়েছে ব্রত? নিজের শরীরের দিকে একবার কি তাকিয়ে দেখবারও সময় পাস্ নি?

ব্রততী চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে অবস্থাটা লঘু করবার চেষ্টা করল। সুখেন্দুকে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যে বলল—ওসব কথা থাক দাদা। অমিতাদির মায়ের ছবিটা আর কদিন লাগবে? অমিতাদি এসেছিল।

কিন্তু ব্রততী নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করলেও সুখেন্দুর কাছে লুকোতে পারল না। সুখেন্দু কঠিন ও কোমল কণ্ঠে বলল—ব্রত আমার কথার জবাব দে। আমি তোকে আজ সব কথা জিজ্ঞাসা

করবার জন্যেই তোর আসার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। আমি বুঝতে পারছি তুই আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে আমার কাছে কি লুকতে চাস?

ব্রততী আবার হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত হাসি বেরল না। তবু হেসে বলল—দাদা তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ? কি যা-তা বকছ? তোমাকে কেন এড়িয়ে চলব? অফিসের কাজের জন্যে আর তোমার খোঁজ নিতে পারি নি।

এই কথায় সুখেন্দু ম্লান হাসল, বলল—ব্রত, আমি জানতাম তুই কোনদিন মিথ্যে কথা বলতিস্ না। কিন্তু দেখছি সে ধারণাও আমাকে বদলাতে হবে। তুই আমার কাছে এসে আমার খবর নিতিস না বটে কিন্তু বাড়ীর সবার কাছে জিজ্ঞাসা করতিস। এমন কি আড়াল থেকে দেখে যেতিস্। ব্রত, আমার এই শুধু দুঃখ যে তুই আমাকে এত বোকা ভাবিস। আমি যে কিছু অনুমান করতে পারি তোর সে ধারণাও আজ হারিয়ে গেছে।

ব্রততী চুপ করে শুধু দাদার কথাগুলো শুনতে লাগল। কোন কথা বলল না। শুধু এক এক সময় সুখেন্দুর কথাগুলো মনে গিয়ে আঘাত করছিল আর ও নিজের বুকে হাত দিচ্ছিল।

সুখেন্দু এবার বোনের দুটো হাত ধরল, তারপর কাতরস্বরে বলল—বল ব্রত আর লুকোসনি। আমি বুঝতে পারছি তুই আমার কাছ থেকে কি যেন এক সাংঘাতিক ব্যাপার লুকিয়ে রেখেছিস্?

ব্রততী কাঁদতে লাগল।

—আমি ত তোকে চিনি। খুব ছোটবেলা থেকে তোর আর আমার সে স্নেহের সম্বন্ধ সে ত কম নয়! আমি যেমন তোকেও চিনি আর তুইও আমাকে চিনিস্। আমি তোকে দেখেই বুঝতে পেরেছি—তুই যেন কি ভীষণ সাংঘাতিক একটা ব্যাপার আমার কাছ থেকে লুকোচ্ছিস্। না হলে তুই আমাকে এড়িয়ে চলে যাস্!

ব্রততী হঠাৎ কিছু না বলে সুখেন্দুর কোলের ওপর মুখখানা

গুঁজে দিয়ে ডুকঁরে কেঁদে উঠল তারপর কান্নাস্বরে বলল—দাদাগো আর বল না। আর বল না তুমি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি ত আমার সবই জানো। তবে আর কেন মিছে জিজ্ঞাসা করছ? আমি, আমি সবাইকে বাঁচাতে গিয়ে আমি নিজে মরে গেছি। আমার এ সর্ব্বনাশের জন্য কেউ দায়ী নয়। আমিই দায়ী। আমার ভাগ্য দায়ী। ব্রততী সুখেন্দুর কোলের ওপর মাথাটা গুজে দিয়ে অঝোরে কেঁদে চলল। কতদিনের জমা করা কান্না, কত অভিমান আজ সব তারা দরজা খুলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে। আজ আর কোন প্রহরী নেই দরজায়। কেউ সঙ্গীন উঠিয়ে তাদের শাসন করবে না। বলবে না—খবরদার। আজ পেয়েছে বলবার লোক। তারা কি আর কোন নিষেধ মানে?

ব্রততী অনেকক্ষণ ফুলে ফুলে কেঁদে চলল সুখেন্দুর কোলের ওপর পড়ে। আর সুখেন্দু সান্ত্বনার বাণী হারিয়ে বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এক সময় বলল দুঃখ করে—একদিন তুই সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করেছিস্ আজ তোকেই সান্ত্বনা দেওয়ার দরকার কিন্তু কি বলে সান্ত্বনা দেব বল—ভাষা যে হারিয়ে যাচ্ছে? সুখেন্দুও কাঁদতে লাগল।

ব্রততী কাঁদতে কাঁদতে বলল—না দাদা তোমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না। আশীর্ব্বাদ কর যেন মরে গিয়ে শান্তি পাই।

—মরবি? সুখেন্দু চমকে উঠল।

—কি করব বল দাদা, মরা ছাড়া আমার কি উপায় আছে?

সুখেন্দু চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর বলল—মা জানে এ সব কথা?

ব্রততী মাথা নাড়ল।—মা বুঝতে পারেন নি এখনও।

সুখেন্দু বলল—বুঝতে পারলে আর কি করতেন? আমার ওপরই বর্ষণ সুরু করতেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—কাল হল সব আমার এই শিল্পী জীবনই।

ব্রততী সুখেন্দুর কোল থেকে অনেক আগেই মাথাটা তুলেছিল। চোখে জল ছিল না তবে চাহনি কাতর। বলল—ও কথা বল না দাদা। তোমার সৃষ্টির মূল্য কেউ দিতে পারবে না।

—যাকগে ওসব কথা যাক্! লোকটা কে আমাকে একবার বলবি?

ব্রততী মাথা হেঁট করল। বলল—ও কথা নিয়ে আর আলোচনা কর না দাদা। যা হবার তা ত হয়ে গেছে। তুমি এসব নিয়ে আর চিন্তা কর না। আমার যা ব্যবস্থা করার হয় আমি করব।

সুখেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—বেশ, আমি আর এসব নিয়ে আলোচনা করব না। তবে কথা দে—আর তুই কোনদিন কোন কিছু লুকোবি না আমার কাছে!

—কথা দিচ্ছি দাদা।

—কাল থেকে তুই আর কাজে যাস্ না। আমি ত বাড়ীতে কিছু টাকা দিয়েছি আরও দেব। টাকার জন্যে আর মনে হয় ভাবতে হবে না।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করল—কোথা থেকে টাকা পেলে দাদা? আবার সেই বিক্রী করা ধরেছ?

সুখেন্দু এত দুঃখেও ম্লান হাসল, বলল—না রে না ওরকম করে নয়। শিল্পীর দামই আমি পাচ্ছি। যাকগে সে সব কথা আর জিজ্ঞাসা করিস না। তোর মত জীবন আহুতি দিইনি এটুকু অন্ততঃ জেনে রাখ। যা ঘরে যা। অনেক রাত হয়ে গেল।

ব্রততী নিঃশব্দে ঘরে চলে যাচ্ছিল।

সুখেন্দু বলল—হ্যাঁ এর জন্যে তুই আর নিজে কিছু ভাবিস্ না। আমি যখন জানতে পেরেছি তোকে আমি বাঁচাবই।

ব্রততী চলে গেল।

সুখেন্দু ভাবতে লাগল—এবার। এবার সে কি করবে? অসিতের বাড়ী থেকে যা ভেবে এসেছিল—শেষ পর্য্যন্ত ঠিক তাই

হল। সুমিতার মতই আজ ব্রততীর অবস্থা। উঃ শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটা এমনি করে নিজের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিল। আর সে নিজে এতদিন ওর ওপর একটা ভুল ধারণা করে যা-তা মনে ভাবছিল। আশ্চর্য্য ব্রততী শুনলে কি ভাবত? তার দাদার ওপর এতখানি শ্রদ্ধা, এতখানি ভালবাসা। নিজেকে শেষ করেও সে জিজ্ঞাসা করছে—"দাদা ছবি বিক্রী করে আবার টাকা যোগাড় করছ না ত? এমন বোন যার তার ওপরও সন্দেহ। সুখেন্দুর ইচ্ছা করল—নিজের হাতের নখাগ্র দিয়ে মনটা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। যে মন এইসব অন্যায় চিন্তা করে সে মন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

অথচ ব্রততী, সে ত একবারও এই ধরণের চিন্তা করে না। সেও ত তার দাদাকে নিয়ে অনেক বাজে চিন্তা করতে পারত! উপযুক্ত দাদা, এক পয়সা উপায় করতে পারে না। নিজের বাপ, মা, ভাই বোনকে খাওয়াতে পারে না। এসব চিন্তা যদি করত ব্রততী, খুব অন্যায় নিশ্চয় হত না! কিন্তু আজ তার শেষ কথাতেও ত সে রকম কোন অর্থ ফুটে ওঠে নি বরং উলটোটাই হয়েছে।

সে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়েছে। সর্ব্বস্ব যখন দিয়েছে তখন—বুঝতে হবে তার আর কোন উপায় ছিল না। না হলে ব্রততী যে মেয়ে, তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে এমন অনিচ্ছাকৃত কাজ কেউ করতে সাহস করবে না। অথচ ব্রততী নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে এই পথে এগিয়ে গেছে এও বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুখেন্দুর ইচ্ছা করছিল—ব্রততীর কাছ থেকে আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা সব জেনে নেয়। কিন্তু বড় ভাই তাও আবার মেয়েদের এ গোপনীয় তত্ত্ব। সব রহস্যটা গোপনই রয়ে গেল। আর জেনেই বা কি হবে? যা হবার তা ত হয়ে গেছে। এখন যদি ওকে বাঁচাতে পারে সেই' চেষ্টাই করা উচিত।

সুখেন্দু সারারাত্রি ধরে ভাবল। ঘুমহীন চোখ দুটো নিয়ে

সারা ঘরময় পায়চারী করে শান্তি খুঁজতে লাগল। উঃ অর্থ না থাকলে কত অধঃপতন হয়? আজ অর্থের জন্য সে হারাল আদর্শ। আঁকছে এখন অর্দ্ধ উলঙ্গ সব মডেল ছবি। ব্রততী অর্থের জন্য নিজের ইজ্জত হারাল। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছাই করে দিয়ে সে পরিবারটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করল। আজ অর্থের জন্য সে বাপ মায়ের কাছে অবহেলিত। বন্ধুবান্ধবের কাছে উপেক্ষিত। আত্মীয়-স্বজনের কাছে ঘৃণিত।

সুখেন্দু সকাল হতে ঠিক করল এখুনি একবার অসিতের সঙ্গে দেখা করা দরকার। ওর কাছে সব বলে একটা ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। ওত সুমিতার জন্যে ডাক্তার সোমের কাছে গেছে যদি ঐ সঙ্গে ব্রততীর ব্যবস্থাটা হয়ে যায়। টাকা। টাকার জন্যে আর আটকাবে না। অসিতের কথা মতই কাজ করলে অনেক টাকা। আজ অসিতকে গিয়ে সে বলবে—অসিত তুই আমাকে অনেক মেয়ে এনে দে—আমি অনেক ছবি আঁকব—আমার টাকা চাই। টাকা দিয়ে আমি একবার সব পরিবর্ত্তন করব। করে দেখব—মানুষ সত্যিকার কি চায়—টাকা, না আর অন্যকিছু। মা বাবা তাকে অবহেলা করেন—একবার প্রচুর টাকা দিয়ে দেখবে তারা কতখানি সুনজরে দেখেন।

টাকা দিয়ে সে নিজের জীবনটাই উলটে দেবে। ও সব আদর্শকে আঁকড়ে রেখে আর বাঁচার পথ রুদ্ধ করে রাখবে না।

ব্রততীকে একবার দরকার ছিল কিন্তু চোখের সামনে পেল না বলে সুখেন্দু আর ডাকল না। রাতজাগা দুটো জ্বালাময় চোখ নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ভাবতে ভাবতে সুখেন্দু অসিতের বাড়ীর কাছে চলে এল। তখনও খুব বিশেষ সকালের আলো ফোটেনি মানে সূর্য্য ওঠেনি। কোলকাতার যে আসল দিন সে দিন তখনও আরম্ভ হয়নি। অর্থাৎ আটটা বাজে নি।

সুখেন্দু কড়া ধরে নাড়ল।

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ সম্ভবতঃ সুমিতার—কে ?

সুখেন্দু বলল—আমি। অসিত আছে ?

—আছে দাঁড়ান। সুমিতা দরজাটা খুলে দিল। দিয়ে অল্প একটু হেসে বলল—ঘরে আছে যান—ঘুমচ্ছে।

সুখেন্দু অসিতের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অসিত খাটের ওপর লম্বা টান টান হয়ে ঘুমচ্ছে। দেখে মনে হয়—যে রকম অগাধে ঘুমচ্ছে বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েকের আগে সে ঘুম ভাঙ্গবে না। সুখেন্দু ইতস্ততঃ করতে লাগল—কি করবে তার আর ধৈর্য্য ধরছিল না। অসিতকে ব্রততীর ব্যাপারটা বলে একটা উপায় ঠিক করে না নেওয়া পর্য্যন্ত কিছুতে যেন ধৈর্য্য আসে না। তাই একটু ইতস্ততঃ করে ঘুমন্ত অসিতকে ঠেলা দিল—অসিত, অসিত।

কোন সাড়া নেই, এমন কি কোন নড়াচড়া পর্য্যন্ত নেই।

ঘরে ঢুকল সুমিতা। সুমিতা হেসে বলল—ওরকম করে ডাকলে আপনি জীবনে কোনদিন দাদার সাড়া পাবেন না। তার চেয়ে দাঁড়ান, চা নিয়ে আসি তখন উঠবে। এখন বলুন ত আপনি চা খাবেন ?

সুখেন্দু মাথা নেড়ে সায় দিল।

সুমিতা বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুমিতা চা নিয়ে এসে সুখেন্দুকে এক কাপ দিয়ে দাদার মুখের সামনে ধরল। তারপর চীৎকার করে বলল—দাদা চা, আর সুখেন্দু দা ?

প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না।

তারপর সুমিতা চায়ের গরম কাপটা অসিতের মুখের কাছে, ছোঁয়াতেই অসিত লাফিয়ে উঠল।—এ্যাঁ কি—?

সুমিতা হেসে বলল—তোমার চা। আর কে এসেছে দেখ।

সুখেন্দু সুমিতার কাণ্ড দেখে এত দুঃখেও না হেসে পারল না।

অসিত সুখেন্দুকে দেখতে পেয়ে উঠে বসে সুমিতার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বিস্মিত হয়ে সুখেন্দুকে বলল—আরে তুই এত সকালে? বিনতা ত এখন আসবে না।

ঘরের কোনটায় কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে সুখেন্দুর শেষ না করা ছবিটা। সেই দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল সুখেন্দু—ছবি আঁকা ছাড়া কি আসতে নেই? ধর না এমনি এলাম।

—উঁহু, তুমি ত এমনি আসবার ছেলে নয় নিশ্চয় কোন হেতু আছে।

সুখেন্দু ম্লান হাসল। তারপর চুপ করে থেকে বলল—তুই ধরেছিস্ ঠিক। হঠাৎ একটা দরকারের জন্যে এলাম।

সুমিতা চলে গেল।

সুখেন্দু ব্রততীর ব্যাপারটা সব অসিতকে বলল।

অসিত সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল—সেম-পজিসন। অথচ তবু এরা চাকরী না করে ছাড়বে না। অবশ্য তোর বোনের কথা বলছি না। তোর বোন ত ইচ্ছে করে সখে চাকরী করতে যায় নি। তার বাস্তবিকই দরকার পড়েছিল তাই গিয়েছে। অথচ দেখ সে দরকারের জন্যে গিয়েও একই ফাঁদে পড়ে গেল। বাস্তবিক তোর বোনের জন্যে সত্যি দুঃখ হয়! তার সাক্রিফাইসের তুলনা হয় না।

অসিত বিছানা থেকে নেমে এল তারপর বলল—তুই কিছু ভাবিস্ না। ডাক্তার সোমের নার্সিং হোমেতে সুমিতার জন্যে ব্যবস্থা করেছি। তোর বোনের জন্যও করে আসবক্ষণ। তবে কিছু টাকার দরকার হবে এই যা।

সুখেন্দু বলল—টাকার জন্যে তুই ভাবিস্ না। আমি যেমন করে হোক্ টাকা যোগাড় করব। আর তা ছাড়া তুই ত আমাকে আঁকবার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছিস্। আরও মেয়ে যোগাড় করে

ঐ যা হয় অনেক আঁকব। তাহলে ত টাকার অভাব হবে না।
অসিত সুখেন্দুর কথা শুনে হাসল, বলল—তুই বোনকে খুব ভালবাসিস্ না?

সুখেন্দু লজ্জিত হল, বলল—ভালবাসা কিছু নয়। যে মেয়েটি বাড়ীর জন্যে নিজেকে ধ্বংস করল তার জন্যে একটু কিছু করতে পারব না?

অসিত অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বলল—তোর সুমতি হোক। মেয়ের জন্যে তুই ভাবিস না। তুই এঁকে যা, আমার কোম্পানীতেই অনেক হ্যাণ্ডসম আছে নিয়ে আসবক্ষণ। আর টাকাত সে কোম্পানী দেবেই বলেছে।

সুখেন্দু ম্লান হাসল তারপর কৃতজ্ঞতার সুরে বলল—সত্যি আজ যদি তোর দেখা না পেতাম তাহলে বোধহয় মরে ভূতই হয়ে যেতাম।

অসিত কিন্তু এ কথায় একটু রেগে বলল—থাম্ থাম্ আবার এসব সুরু করেছিস্ কি? কার জন্যে কে কি করে? আমার কিছুটা ক্ষমতা ছিল সেটা লাগিয়ে দিয়েছি মাত্র। ওসব ভদ্রতা করে কৃতজ্ঞতা তোকে জানাতে হবে না।

সুখেন্দু চুপ করে অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ এমনি নিঃশব্দে দুজনের কেটে গেল।

তারপর অসিত জানালার বাইরে সকালের শান্ত নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে বলল—বারটার সময় আসছিস্ ত। বিনতা কিন্তু আসবে।

সুখেন্দু মাথা নাড়ল।

অসিত আবার বলল—ছবিটা আজকে হলেই শেষ হয়ে যাবে না?

সুখেন্দু মাথা নেড়ে বলল—মনে ত হচ্ছে।

—তাহলে ওকেই দিয়ে আর একখানা ছবি আঁক্ না।

—আমিও তাই ভাবছিলাম। তবে ও কী রাজী হবে?

—রাজী হবে না মানে? ঠিক রাজী হবে। বরং এ প্রস্তাব শুনে সে আমাকে খুসী হয়ে ধন্যবাদ দেবে। তুই ত জানিস না

ওদের অবস্থা। বিনতাকে যদি বলি আরও দশটা টাকা দেব—ও যে কি বলে আমাকে ধন্যবাদ দেবে, হয়ত ভাষাই খুঁজে পাবে না।

অসিত ম্লান এক টুকরো হাসল।

সুখেন্দু গাত্রোত্থান করে বলল—তাহলে আমি যাই অসিত। আমার জন্যে তুই নিশ্চিন্ত থাকিস্। এখন যা তুই বলবি তাই আমি করব। শুধু তার পরিবর্ত্তে আমার টাকা চাই। দেখছিস ত বোনটি আমার টাকার জন্যে কেমন ভাবে ইজ্জতটা খোয়াল।

সুখেন্দু চলে এল। পথে আস্তে আস্তে শুধু ব্রততীর মুখটাই ওর মনে পড়তে লাগল। ব্রততী আজ তার জন্য নিজের জীবন পণ করেছে আর সে তার জন্য কিছুই করতে পারে নি। অসিত যদি ছবি আঁকার ব্যবস্থাটা পাকা করে দেয় আর ডাক্তার সোমের নার্সিং হোমে ব্রততীর জন্যে ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে আর তাকে কোন কিছু ভাবতে হবে না। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কি ····। হঠাৎ সুখেন্দু একটু চমকে উঠল—ব্রততীর গর্ভে যে সন্তান হবে সে সন্তানের কি ব্যবস্থা হবে? ইস্ সেটা একবার অসিতকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত ছিল। সুমিতার সন্তানের যা ব্যবস্থা করবে অসিত, সেও ব্রততীর সন্তানের তাই ব্যবস্থা করবে। হয়ত অসিত আশ্রমে দিয়ে দেওয়ারই ব্যবস্থা করবে। সেই ভাল, কোন ঝঞ্ঝাট না করে আশ্রমে দিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে। আর তারপর একটু অন্য কোন জায়গায় গিয়ে একটা ভাল ছেলে দেখে ব্রততীর বিয়ে দিয়ে দেবে।

এ সব বিষয় একবার অসিতের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিতে হবে।

তারপর কয়েক মাস পর।

সব ব্যবস্থাই করা ছিল। সময় হতে সুখেন্দু একটা গাড়ী করে ব্রততীকে ভবানীপুরে ডাক্তার সোমের নার্সিং হোমে নিয়ে এল।

ডাক্তার সোম হোমেই ছিলেন। অসিতের কাছ থেকে ব্রততীর বিষয় সব শুনেছিলেন। সুখেন্দু পরিচয় দিতে ডাক্তার সোম স্মিতহাস্যে বললেন—ঠিক আছে আর কিছু বলতে হবে না—সুমিতা দেবের পাশের সিটই ঠিক করা আছে।

তারপর তিনি একটী নার্সকে ডেকে বললেন—স্তুতি, এনাকে সুমিতা দেবের পাশের সিটটায় শুইয়ে দাও।

স্তুতি মাথা নেড়ে ব্রততীকে নিয়ে চলে গেল।

সুখেন্দু ব্রততীর গমন পথের দিকে একবার চেয়ে ডাক্তার সোমকে জিজ্ঞাসা করল—যদি কিছু হয় খবর কখন পাব?

ডাক্তার সোম কি একটা পড়ছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না—কিছু হলে আমরা বাড়ীতে খবর পাঠাব।

—স্যর একটু ভাল করে কেয়ার নেবেন। আমার…। সুখেন্দুর গলাটা আর্দ্র হয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তার সোম একটু মুচকে হাসলেন, বললেন—আপনার বোন ত। কিছু ভাবতে হবে না। আমার হোমে সবাই যত্নই পায়। আর তা ছাড়া আপনি অসিত দেবকে জিজ্ঞাসা করবেন—তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার হোমটা কি!

তার বোনের ডেলিভারী হবার সময় কোন বাজে ট্রাবল পেয়েছে কিনা? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান কোন ভয় নেই।

সুখেন্দু নিশ্চিন্ত হয়ে 'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে এল।

সুমিতার গর্ভে টমাস কেলির ছেলে হয়েছে। সুখেন্দু দেখতেও এসেছিল একদিন। নাঃ! সাহেবদের ব্লাডের গুণ আছে। এমন চমৎকার ফুটফুটে ছেলেটী দেখতে হয়েছে, যে দুদণ্ড না দেখে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। অথচ ঐ ছেলেকে জারজ বলে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হবে। অসিত ঠিক করেছে ছেলেটাকে আশ্রমেই দেবে। সুমিতা নাকি প্রথম শুনে কিছুতে দিতে রাজী

হয় নি। এই নিয়ে দাদার সঙ্গে ওর একটু কেমন জানি মন কষাকষি হয়েও গিয়েছিল। হাজার হোক, দশমাস পেটে ধরা নাড়ীর টান ত! অন্যায় ভেবে ও মায়া ছাড়ে নি। সুমিতা বোধ হয় সেই মায়ার জন্যেই বলেছিল—ওকে আমার কাছেই রেখে দেব।

অসিত শুধু ধমকে সে ইচ্ছে বধ করেছে—না, যার কোন পরিচয় তুই কোনদিন দিতে পারবি না তাকে কাছে রাখতে পারবি না।

সুমিতা বলেছে—কিন্তু ও কি দোষ করেছে? ওর ত কোন দোষ নেই।

—দোষ নেই! অসিত লাফিয়ে উঠেছে—দোষ নেই ত ওরকম ব্যর্থ পরিচয় নিয়ে ও এল কেন? খিড়কির দরজা দিয়ে না এসে সদর দরজা দিয়ে আসতে পারল না?

শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হল। পরিচয়হীন সন্তানের স্থান হবে অনাথ আশ্রমের ঘরে। ব্রততীকে সুখেন্দু বলতে ব্রততী কিছু বলল না শুধু বলল—তুমি যা ভাল বোঝ দাদা তাই কর, আমার কিছু বলার নেই।

সুখেন্দু ঠিক করল—ডাক্তার হোমের নার্সিং হোম থেকে ফেরবার দিন অনাথ আশ্রমে ছেলেটাকে দিয়ে চলে আসবে। আর আসবার সময় অনাথ আশ্রমের ফাণ্ডে কিছু টাকা দিয়ে আসবে।

আজকাল ত টাকার কোন অভাব নেই। অসিতের চেষ্টায় এই ন মাস দশমাসে সে এখন বেশ কিছু উপায় করেছে। শুধু ছবি। ভাল ভাল হ্যাণ্ডসম গার্ল ধরে এনে তাদের কিছু টাকা দিয়ে এক একখানা ইঙ্গিতপূর্ণ পোট্রেট। অসিতের সেই বিদেশী কোম্পানী ত লুফে নিচ্ছে আর বলছে—প্রোডাকসন্‌টা বড কম হয়ে যাচ্ছে মিঃ বোস—আরও একটু কুইক করান। আজকাল বড় অর্ডার আসছে এই ছবির। মংলিন কোম্পানী আজকাল এক একখানা ছবির দাম দিচ্ছে তিনশ টাকা। আগে দিচ্ছিল দুশ। কয়েকটা ছবি সাপ্লাই করার পর অসিত সুখেন্দুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনশ করে দিয়েছে।

জাতিতে চাইনিশ বলে ব্যবসাটা ভাল বোঝে। অসিতের প্রস্তাবে না বলেনি মংলিন। হেসে বলেছে—মিঃ দেব ইজ্ সো ভেরি ক্লেভার।

আজকাল সুখেন্দু আর অসিতের বাড়ীতে ছবি আঁকে না। আঁকে নিজের বাড়ীতে। বাইরের দিকে একটা ঘর অনেকদিন পড়েছিল। সেটা বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঠিক করে নিয়েছে।

এখন শুধু তার সময় বেশীর ভাগ কাটে মেয়ে খুঁজতে। যেখানে সে সন্ধান পায় সেইখানেই গিয়ে শিকারী বিড়ালের মত সে খোঁজ নেয়। মেয়ে তার আবশ্যক, প্রচুর মেয়ে। মেয়ে না হলে তার আঁকা বন্ধ হয়ে যাবে। আর আঁকা বন্ধ হয়ে গেলে টাকা উপায়ের পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

বাবা মা এখন যথেষ্ট ভালবাসে। কিসের জন্যে? ঐ টাকার জন্যে। বন্ধুবান্ধব হেসে কথা বলে—কিসের জন্যে? ঐ টাকার জন্যে। ব্রততী জানতে পেরে একদিন দাদাকে বলতে এসেছিল। সুখেন্দু তাকে সরিয়ে দিয়েছে। বলেছে না ব্রত, তুই আমাকে আর বাধা দিস্ না। আমার টাকা, চাই প্রচুর টাকা। আমি টাকা নিয়ে এবার ছিনিমিনি খেলে দেখব—কে বড়—টাকা না অন্য কিছু। আজ তোর এই অবস্থা, এর জন্য দায়ী কে? আমি। আর আমার এ অপরাধের জন্য দায়ী কে? টাকা। আর টাকার জন্য দায়ী কে? আমার এই আদর্শ। সেই আদর্শকে আমি গুলি করেছি। ভুয়ো আদর্শের দোহাই দিয়ে আর অন্ধকারে পচে মরতে পারব না। ব্রত, তুই আমাকে আর সে অনুরোধ করিস না। আমি পারব না, আমি তোর কোন কথা আর শুনব না। একদিন ত যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে তুই অনেক কিছু সহ্য করেছিস্। তার ফল কি পেয়েছিস্? তোর নিজের সর্ব্বনাশ। আর তুই আমাকে চুপ করে থাকতে বলিস্ ব্রত? তুই কি পাষাণী?

ব্রততী দাদার কাছ থেকে সরে গেছে। আড়ালে কাঁদতে

কাঁদতে বলেছে—আর পারলুম না, আর পারলুম না। আবার আর একটা প্রতিভার অঙ্কুরে বিনাশ হল।

সুখেন্দুর এখন শুধু মেয়ের দরকার হয়। অনেক মেয়ে, গাদা গাদা, সংখ্যাহীন। সেইজন্যে সুখেন্দু মেয়ের সন্ধানে এমন এক একটা জায়গায় যায়—যার কথা আগে মনে হলে সুখেন্দু ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করত।

সহরের ভাল ভাল ইউরোপীয়ানদের বারে যায়। এ্যাংলো মেয়েগুলোর সঙ্গে নাচে, মদ খায়—বিয়ার—হুইস্কি—ব্রাণ্ডি। নাচা হয়ে গেলে প্যাণ্টের হুটো পকেট থেকে হুহাত মুঠি করে টাকা পয়সা বের করে মেয়েগুলোর সামনে ছড়িয়ে দেয়। মেয়েগুলো পয়সা-গুলো কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে। মদের নেশায় সুখেন্দু খপ্ করে একটি মেয়ের হাত ধরে ফেলে। তারপর তাকে ট্যাক্সি করে আনে বাড়ীর বাইরের সেই ঘরে।

প্যাণ্টের পকেট থেকে চাবিটা বার করে ঘরটা খোলে। লাইট জ্বালে। মেয়েটাকে সামনে বসিয়ে দিয়ে ক্যানভাস এঁটে তুলি চালায়। সারা রাত কেটে যায়। সকাল বেলা দেখা যায়—এক পাশে মেয়েটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে আর সুখেন্দু অন্য পাশে। ছবিটা প্রায় সমাপ্ত।

হয়ত মেয়েটার আগে ঘুম ভেঙে গেল। মেয়েটা উঠে গত রাত্রির কথা স্মরণ করে সুখেন্দুর গায়ে গিয়ে ঠেলা দেয়—এ মিষ্টার, এ মিষ্টার।

সুখেন্দুর হয়ত ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর এ্যাংলো মেয়েটীর মুখের দিকে চেয়ে হাই তুলে বলে—কি হল? বাড়ী যাবে? বেশ যাও। ঐ দরজাটা খুলে নাও। তোমার টাকাটা রাত্রে গিয়ে দেব।

মেয়েটী দরজা খুলে হয়ত চলে গেল।

সুখেন্দু আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করে। কিন্তু এপাশ ওপাশ কিছুক্ষণ করে কিন্তু ঘুম আর আসে না। তারপর উঠে বসে

একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্যানভাসের দিকে তাকায়। তারপর বাঁ হাতে সিগারেটটা ধরে স্মিতহাস্যে ক্যানভাসের বুকে আবার তুলি বুলতে থাকে।

অনেকক্ষণ চলে তুলি বুলনোর কাজ, তারপর সুখেন্দু স্নান করবার জন্যে বাড়ীর ভেতর চলে যায়।

ঐ ছবিটা তারপর আর একদিন ভাল করে খেটে ফিনিশ করে মংলিন কোম্পানীতে দিয়ে আসে। টাকাটা নিয়ে এসে কিছু বাড়ীতে দিয়ে আবার মেয়ে খুঁজতে বেরয়।

এই সব কাণ্ড দেখে একদিন অসিত হেসে বলল—সুখেন্দু "অতি বাড় বেড় না, ঝড়ে পড়ে যাবে।" বন্ধু একটু রইয়ে সইয়ে কর।

সুখেন্দু হাসে। আজকাল সুখেন্দুর চেহারারও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। পাঞ্জাবী ছেড়ে সার্ট, কাপড় ছেড়ে প্যাণ্ট, চটী ছেড়ে সূ মোজা। আগে কোন নেশাই করত না এখন গোল্ড ফ্লেক সিগারেট।

বাড়ীরও ভোল পালটে দিয়েছে।

ব্রততীকে নার্সিং হোমে দিয়ে এসে সেদিন সুখেন্দু বাড়ীই ছিল। আর চিন্তা—কি হয়? খবরটা না পাওয়া পর্য্যন্ত খুব বিশেষ যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

হঠাৎ রাত্রি আটটার সময় ডাক্তার সোমের এক চিঠি নিয়ে একটী লোক এসে উপস্থিত।

তাড়াতাড়ি সুখেন্দু রুদ্ধ নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেলল।

ডাক্তার সোম লিখেছেন—

"কাম ইমিজিয়েট্‌লী, কেস ইজ সিরিয়াস।"

কোনরকমে জামাটা সুখেন্দু গলিয়ে নিয়েই ট্যাক্সি করে নার্সিং হোমে ছুটল।

ডাক্তার সোম হোমেই অপেক্ষা করছিলেন সুখেন্দুর জন্যে। সুখেন্দুকে দেখে ডাক্তার সোম একটু ম্লান হেসে বললেন—মিঃ বোস—কিছুতে পারলাম না আপনার বোনকে রক্ষা করতে। সি ইজ ডেড।

—ডেড? সুখেন্দুর দেহের মধ্যে কে যেন এ, সি, ক্যারেন্টের চার্জ্জ দিল। বড় বড় চোখ করে বলল—কি বলছেন আপনি—ব্রততী নেই?

—না।

—না?

ডাক্তার সোম একটু কাতরস্বরে বললেন—আপনি একটু শান্ত হন সুখেন্দুবাবু? আমার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটী আমি করিনি কিন্তু পারলাম না। বেবিটাকে বাঁচাতে পেরেছি কিন্তু তার মাকে আর রক্ষা করতে পারলুম না।

সুখেন্দু নিজেকে সংযত করবার জন্যে চেয়ারে বসে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল। আঘাত সহ্য করার মত ক্ষমতা কোথায়? ব্রততী আজ নেই! এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

প্রায় মিনিট পনের মাথাটা নীচু করে থেকে সুখেন্দু মাথাটা তুলল। তার দুটী চোখ বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়ছে। কোন রকমে ধরা গলায় বলল—আপনি ডেথ্ সার্টিফিকেটটা লিখে রাখুন ডাক্তারবাবু, আমি একবার তাকে দেখে আসি। তারপর ও নার্সের সঙ্গে ব্রততীর মৃতদেহের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

একটা শান্ত সুন্দর ঘুমন্ত মুখ। এতটুকু যন্ত্রণার ছাপ পর্য্যন্ত নেই মুখে। যেন ঘুমিয়ে আছে ঘুমকুমারী।

সুখেন্দু ছুটে গিয়ে ব্রততীর ঠাণ্ডা হাতটাই চেপে ধরল। তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।—এ কি করলি তুই ব্রত? আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেলি।

সুখেন্দু সেখানে দাঁড়িয়ে মৃতবোনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল। তারপর ডাক্তার সোমের কাছে এসে বলল—আমি ট্যাক্সি

নিয়ে আসছি আপনি ভাল করে মৃতদেহটা কাপড় দিয়ে মুড়ে দিন।

ট্যাক্সি এনে সুখেন্দু কোলে করে ব্রততীকে নামিয়ে নিয়ে এল। ডাক্তার সোমকে বলল—বাচ্চাটার যা হোক ব্যবস্থা পরে করব, এখন আমি যাচ্ছি।

ডাক্তার সোম মাথা নাড়লেন। তারপর ওপরে চলে গেলেন।

সুখেন্দু ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলল—চল নিমতলা শ্মশান।

ড্রাইভার একবার পিছন দিকে তাকিয়ে কি ভেবে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

ট্যাক্সি ছুটল।

ভেতরে ব্রততীর মৃতদেহ কোলে করে সুখেন্দু। ভাবছে শেষ পর্য্যন্ত এই তার ভাগ্যে ছিল। পৃথিবীতে একটী মাত্র আপন জন ছিল তাও সে হারাল। মানুষ এ জগতে বাঁচে—শুধু আকর্ষণের জন্যে। আকর্ষণ ফুরিয়ে গেলে পরিত্যক্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা আর না থাকা একই সমান। ব্রততী স্নেহ করত, শ্রদ্ধা ছিল সুখেন্দুর ওপর অগাধ। আজ ব্রততী নেই। সুখেন্দু বোন হারাল না বন্ধুকে হারাল।

আর সে বন্ধুকে সে নিজে হাতে বধ করেছে। যতকাল এই জীবন নিয়ে সুখেন্দু বেঁচে থাকবে ততকাল তার স্মরণ থাকবে।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে। কলকাতা সহরটা মিনিটে মিনিটে পিছিয়ে পড়ছে। রাস্তার আলোগুলো মাঝে মাঝে ট্যাক্সির ভেতরে ব্রততীর মুখের ওপর এসে পড়ছে। হিমশীতল দেহটা নড়ে উঠছে গাড়ীর ঝাঁকানিতে। সুখেন্দুর কোলের ওপর থেকে যেন দেহটা পালিয়ে যেতে চায়। সুখেন্দু ভাল করে বার বার বোনের দেহটা বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

আর চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—কড়ি কোমল নিষ্পাপ সুন্দর ফুলের মত মুখখানা। আধ বোজা চোখ দুটী যেন কোথায় গিয়ে

স্বপ্ন দেখছে। এখুনি হয়ত জেগে উঠবে। বলবে—দাদা এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

সুখেন্দুর মোহ কেটে যাবে। তাড়াতাড়ি বোনকে পাশে বসিয়ে দিয়ে বলবে—ওহো, ভুলে গিয়েছিলাম রে ? কিছু মনে করিস্ না। তারপর সুখেন্দু ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলবে—ড্রাইভার গাড়ী ঘোরাও !

ড্রাইভার বলবে—কাহে বাবু নিমতলা জায়গা নেই !

ব্রততী অবাক হয়ে সুখেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে—দাদা, নিমতলায় কেন যাচ্ছ ?

কোন উত্তর নেই। সুখেন্দুকে হাঁ করে কিছুক্ষণ বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। তারপর কোন উত্তর না খুঁজে পেয়ে অহেতুক ধমক দিতে বাধ্য হবে ড্রাইভারকে—কোন বোলা তোম্‌কো নিমতলা ঘাট !

—বাবুজী, আপ্ তো বোলা।

—নেহি, গাড়ী ঘুমাও।

গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ছুট।

পাশে ব্রততী আর সুখেন্দু। ভাই আর বোন। সুখেন্দু আবার শক্তি ফিরে পাবে। ব্রততী আবার বলবে—দাদা তুমি সাধনা কার যাও, দেখবে তোমার নাম একদিন হবেই।

ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে ফেলল।

সুখেন্দুর সব স্বপ্ন কেটে গেল। তাকিয়ে দেখল কোলে ব্রততীর মৃতদেহ। ব্রততী সত্যি জাগেনি, মরে গেছে। সামনে শ্মশান। মড়া পোড়ার দুর্গন্ধ আসছে আর আগুনের ঝাঁঝ বাতাসে। মাঝে মাঝে শ্মশান যাত্রীদের উদাত্ত কণ্ঠ—'বল হরি হরি বোল'।

সুখেন্দু কোলে করে মৃতদেহটা নিয়ে শ্মশানের মধ্যে ঢুকল তারপর একটা চুলির পাশে রেখে বাইরে এল।

এইরকম খাটহীন অদ্ভুত কায়দায় মৃতদেহ শ্মশানে আনতে

শ্মশানের যাত্রীরা একটু বিস্মিত হয়ে গেল। তারা ব্রততীর মুখের কাছে এসে দেখতে লাগল।

সুখেন্দু ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে বার্নিং ঘাটের অফিসে গেল। তারপর সেখানকার কাজ সাঙ্গ করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একগাদা মোটা ফুলের মালা কিনল। কিনে নিয়ে একেবারে ব্রততীর কাছে এল। ব্রততীর সারা দেহটা ফুল আর মালায় মুড়ে দিয়ে চুপ করে একপাশে বসে রইল।

কয়েকজন শ্মশানযাত্রী এসে জিজ্ঞাসা করল—কিসে গেল মশাই ?

সুখেন্দু কথা বলল না।

—দাদা কি শুনতে পাচ্ছেন না ? জিজ্ঞাসা করছি—কিসে গেল ?

সুখেন্দু একটু বিরক্ত হয়ে বলল—গেল, অসুখ করেছিল।

—আহা কচি বয়েস। আপনার বউ বুঝি !

—না, বোন।

—ও, বিয়ে হয়েছিল ?

—না।

—আহা, আইবুড়ো গেল ? বাঁচলে পরে কারও ঘরআলো করত !

সুখেন্দু মুখ ঘুরিয়ে নিল।

শ্মশানযাত্রীরা আবার জিজ্ঞাসা করল—আত্মীয়স্বজন আপনার বুঝি কেউ নেই ?

—থাকবে না কেন ?

—সঙ্গে নিয়ে এলেন না ! আপনি একা নিয়ে এলেন কি-না তাই বলছি।

সুখেন্দু কোন কথার উত্তর দিতে চায় না দেখে শ্মশানযাত্রীরা বিরক্ত হয়ে পথ নিল।

অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন শ্মশান। তার মধ্যে গোটা কয়েক চুল্লির অগ্নিশিখা। কালো ধোঁয়া আর লাল রক্ত রঙয়ের আগুন।

অন্ধকারের কালোর ওপর লাল আগুনগুলো যেন বীভৎস হয়ে উঠেছে। মরাগুলো ফাটছে, বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুলছে। চাপ চাপ ধোঁয়া আর আগুণের অগ্নিশিখা তার ওপর এত লোক। হঠাৎ কোন বিদেশী এলে ভুল করতে পারে—এখানে কোন অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

জলন্ত মড়াগুলোকে শ্মশানযাত্রীরা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ভাঙছে আর আগুনের আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

কেউ কেউ মড়া পুড়িয়ে একটু দূরে গঙ্গা থেকে জল এনে ঢালছে। তারপর জল ঢালা হয়ে গেলে 'বল হরি হরি বল' বলে চলে যাচ্ছে।

কতকগুলো হেংলা কুকুর আর আস্তানাহীন ছাই ভস্ম মাখা ভণ্ড সন্ন্যাসীর দল। সবাই আসে আর যায়, তারা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর যায় না। এরা রয়েই যায় শ্মশানে।

কুকুরগুলো নিবনো চুলি থেকে কিছু খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে। কিংবা মৃতদেহের গায়ের কাপড়গুলো শোঁকে। শুঁকে যে কি পায় বোঝা যায় না! আর সন্ন্যাসীরা। তারা এক জায়গায় বসে আছে। শোকার্ত্তরা কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তারা ওমনি উপদেশ দিতে শুরু করছে—

—মানুষ অমর। মানুষ মরে না। এই যে সব দেহ অগ্নি-তাপে ভস্মীভূত হচ্ছে এদের খোলসটাই ছাই হয়ে যাচ্ছে। আসলে নিরাকার যে আত্মা, সে আত্মা ঠিক থাকছে। সে আত্মা আবার কারও খোলস ধারণ করে জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের এই খোলসটা নিয়েই যত মায়ার বাঁধন। দুঃখ কি? আজ আছি কাল নেই। তিনি ছিলেন, চলে গেছেন। তিনি এ পৃথিবী ছেড়েছেন কিন্তু আর এক পৃথিবীতে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন। কান্না কেন? শুধু মায়ার বেড়া। যতক্ষণ আপনার বাবা ছিলেন ততক্ষণই ছিলেন। যেই চোখ বুজিয়েছেন ওমনি সব পর। তখন সে

আত্মা আর আপনাকে সন্তান বলে কোন সাহায্য করবে না। শোক করবেন না। শোক করে কি হবে?

মনটা কঠিন করুন। সব বুঝতে পারবেন। কেন মায়ার বেড়ায় জড়িয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করছেন?

এই যে দেখছেন না—আমরা এই শ্মশানে দিনরাত আছি—কেন জানেন? আমরা লক্ষ্য করছি—দেখছি কোন সময় একবার শ্মশানটা ফাঁক যায় কিনা। কিন্তু আশ্চর্য্য আজ পর্য্যন্ত মৃত্যুর আর শেষ দেখলুম না। শুধু মরেই চলেছে। এটুকু বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। সেই প্রসূতি সদন। সেই সদনে কিন্তু আমরা কেউ যাই না। কেন জানেন? আমাদের এইখান থেকে বসেই আমরা হিসাব রাখতে পারি—কে মরে গিয়ে জন্মগ্রহণ করল! কার আত্মার মুক্তি হল না ঐ তাল গাছে বসে রয়েছে …।

সুখেন্দুর সামনের চুলিটা পরিস্কার করে দিয়ে একটা ডোম কাঠ সাজিয়ে দিল। সুখেন্দু ব্রততীকে চুলিতে শুইয়ে দিল। তারপর তার মুখে আগুন জ্বেলে দিতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সন্ন্যাসীগুলো বলছিল—খোলসটাই মায়া। ঠিকই, ব্রততীর খোলসটাই ইচ্ছা করছিল না পোঁড়ায়। কিন্তু কি হবে রেখে? রাখা ত আর যাবে না, পচে যাবে।

ব্রততীর চুলি জ্বলে উঠল। প্যাকাটীর আগুণ দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

সন্ন্যাসীগুলোর উপদেশ এখনও শোনা যাচ্ছে—কেন শোকার্ত্ত হচ্ছ—মিছে মায়া। পারত ভুলে যাও।

অন্ধকার শ্মশান। যমদূতের মত লাল অগ্নিশিখার মধ্যে একদৃষ্টে সুখেন্দু দগ্ধ ব্রততীর দিকে চেয়ে রইল। চোখে উদ্গত অশ্রু। বুকটা যেন কে চুরমার করে ভেঙ্গে দিচ্ছে। বুকে যন্ত্রণা—

হঠাৎ পিঠে এসে কে হাত দিল।

সুখেন্দু আচমকা চমকে উঠে পিছনদিকে তাকাল—কে ?

—আমি।

আমি বলে যে সামনে এসে দাঁড়াল তাকে কোনদিন দেখবে সুখেন্দু ভেবে পায়নি। সে সুচরিতা।

সুচরিতা ম্লান হেসে ব্রততীর দগ্ধ মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি চললে বোন। তুমিই স্বর্গ পেলে। এমন ভাইয়ের হাতের আগুন। মরে গিয়েও তুমি ধন্য।

সুখেন্দু সুচরিতাকে হঠাৎ দেখে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ভাবটা নিশ্চিহ্ন হতেও তার বেশ কিছুক্ষণ লাগল। বিশেষ করে সুচরিতার পোষাক। সুচরিতাকে দেখে আজকে আর মনে হয় না ডাক্তার অনিমেশ মুখার্জীর একমাত্র দুলালী মেয়ে সেই নাচিয়ে সুচরিতা মুখার্জী। বরং নিতান্ত সাধারণ যত সাধারণ হয় সেই ঘরের একটী দুঃখী মেয়ে। সুচরিতা এসেছে সামান্য একটা অর্ডিনারী কাপড় পরে, বিলাসিতার সবচিহ্ন নিশ্চিহ্ন।

সুখেন্দু বিস্মিত হয়ে নিম্নস্বরে বলল—একি আপনার অবস্থা সুচরিতা দেবী ? হঠাৎ এখানে ?

সুচরিতা বলল—কেন, আসতে নেই ?

—না, তা বলছি না, হঠাৎ এইখানে দেখব আশা করিনি কিনা ?

সুচরিতা ম্লান হাসল, বলল—আশা অবশ্য অনেকেই করেনি। আমিও কি আশা করেছিলাম ! কিন্তু আসতে হল।

—আসতে হল। কেন খুব কি দরকার পড়েছিল আসার ? সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ, একটু দরকার পড়েছিল বৈকী ? না হলে কি কেউ আসে ?

সুখেন্দু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি দরকার ? অনিমেশ-বাবু ভাল আছেন ত !

—জানি না !

—জানি না মানে ! বাবার খবর জানেন না।

সুচরিতা আবার ম্লান হাসল, তারপর বলল—থাকগে সে বলতে গেলে অনেক কথা,—এটুকু নিশ্চয় আপনি শুনেছিলেন যে আমি একা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলাম।

সুখেন্দু মাথা নাড়ল—হ্যাঁ সে কথা সে শুনেছিল।

—কিন্তু কেন গিয়েছিলাম জানেন? জানেন না! আমার বাবার অত্যাচারে। বাবা যেদিন একটী নার্সকে নিয়ে এসে বললেন সুচরিতা ইনি তোর মা। মার স্নেহ ত কোনদিন পাসনি আজ সেই জন্যে একে নিয়ে এলাম। কি বলব সুখেন্দুবাবু সেদিন আর সহ্য করতে পারলুম না। এতদিন বাবার অত্যাচার সহ্য করেছি আর নিজেকে নিজের মনের বিরুদ্ধে তৈরী করবার চেষ্টা করেছি। বাবা জানতেন—মেয়ে সুখে আছে, নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে স্ফূর্ত্তি করছে। আর তিনি তাই ভেবে দিন রাত যত নার্স নিয়ে··· ।

তারপর একদিন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গল। আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলুম না। একাই কিছু টাকা নিয়ে পৃথিবী পর্য্যটনে বেড়িয়ে পড়লাম। অনেক ঘুরেছি সুখেন্দুবাবু, কিন্তু কিছুতে শান্তি পাইনি। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কেবল মনে হয়েছে—আপনার কথা।

আজ আপনার কাছে অতদূর থেকে ছুটে চলে এলাম। বাড়ীতে গিয়েছিলাম—বললেন হাসপাতালে। হাসপাতালে যেতেই শুনলাম আপনি ব্রততীর মৃতদেহ ট্যাক্সি করে নিয়ে চলে গেছেন, শ্মশানে এলাম।

আজ আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন? একদিন আপনিই শুধু আমাকে ঘৃণা করেছিলেন। আর সবাই মাথায় তুলতে চেয়েছিল। সবাইয়ের কথা অত মনে নেই, কিন্তু আপনার ঘৃণাটাই আমাকে অতদূর থেকে আবার এখানে নিয়ে এল।

আর জানাতে এল—নিজের আসল স্বরূপ—আপনি যা ভাবেন আমি তা নই।

সুখেন্দু এগিয়ে ব্রততীর চুলিতে একটা বাঁশ দিয়ে খোঁচা মেরে ঠিক করে দিল।

তারপর বলল—যাকগে সে সব ত হয়ে গেছে এখন আর ওসব আলোচনা করে কি হবে। এখন আছেন কোথায় ?

সুচরিতা সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—আপনি আমাকে ঘৃণা করতেন বলেই আপনার কাছে আসতে আমাকে বাধ্য হতে হল। আমি আসলে সেই জাতের মেয়ে নয় যে রূপ আপনি আমার দেখেছিলেন। নাচতে আমাকে হয়েছিল, ছেলেদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে হয়েছিল সে শুধু বাবাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে।

সুখেন্দু বলল—কিন্তু এসব কথা আজকে বলার আর কি প্রয়োজন আছে ? সেত অনেকদিন চুকে গেছে। ইচ্ছে করলে আপনি ত আমাকে ভুলে যেতে পারতেন।

সুচরিতা মাথা হেঁট করল। চুলির লাল আগুনে সুখেন্দু যদি সুচরিতার মুখের দিকে তাকাত তাহলে বুঝতে পারত—আসল ব্যাপারটা। কিন্তু সুখেন্দু অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। সুচরিতা মাথা নীচু করে বলল—পারিনি বলেই ত ছুটে এসেছি। তারপর সুচরিতা নিজের ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বার করে বলল—নিন এটা। লণ্ডনের এক একজিবিশন থেকে আপনার সেই ছবিটা ফাষ্ট´ হয়ে এসেছে। খুব শীঘ্র ওটার জন্যে আপনি দু-হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন।

সুখেন্দু কাগজটা হাতে নিয়ে ম্লান হেসে বলল—টাকার একদিন সত্যিই দরকার ছিল সুচরিতাদেবী, আর সেদিন সত্যিই আমি অনেক উৎপীড়ন করেছি সবাইকে। কিন্তু আজকের আর আমার কোন দরকার নেই। আর তা ছাড়া সে ছবি ত একশ টাকার বিনিময়ে আপনি আমাকে দিয়ে তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। তার সমস্ত স্বত্ব ত আপনার। সুতরাং আজকে ওটাকার লোভ দেখিয়ে আর আমাকে অপমান করবেন না।

—অপমান ? সুচরিতা অবাক হয়ে সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর কাতর স্বরে বলল—আপনি কি এখনও আমাকে ভুল বুঝবেন ?

—কেন ? ভুল কেন বুঝব ? ঠিকই বুঝেছি।

—তাহলে আমাকে এমনভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ?

—তাড়িয়ে দিচ্ছি ? সুখেন্দু শুধু হাসল। হেসে বলল—তাড়িয়ে ত দিয়েছে আমার বোন আমাকে। আপনাকে কেন তাড়াতে যাব—অধিকার কি ?

সুচরিতা মরীয়া হয়ে বলল—অধিকার কি ? কেন অধিকার কি চেয়ে নেওয়া যায় না ? যাক্‌গে আমি চলে যাচ্ছি। সুচরিতা হঠাৎ ঝর ঝর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলল। তারপর সুখেন্দুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল—আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমার সমস্ত অপরাধের জন্য। শুধু এইটুকু আমার আক্ষেপ রইল, তোমার কাছে আমি নকলই রয়ে গেলুম। আমার আসল পরিচয় আর জানান হল না।

এই শ্মশানে এত লোকের সামনে সুচরিতাকে তার পায়ের কাছে বসে পড়তে দেখে সুখেন্দু অস্থির হয়ে উঠল, বলল—ইস্‌ একি করছেন ? না, আপনার দেখছি মাথার ঠিক নেই চলুন আপনার বাড়ীতে আমি দিয়ে আসি। দেখছেন ত এদিকে আমার বোন মরে গেছে মাথাটা আমার ঠিক নেই। কি বলতে কি বলে ফেলেছি।

সুচরিতা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি বাড়ীতে থাকি না।

—কোথায় থাকেন ?

—ঠিক নেই।

হঠাৎ সুচরিতা কোন কিছু না বলে সেই অন্ধকারের পথে হারিয়ে গেল। যেমন আকস্মিক এসেছিল তেমনি আকস্মিক অন্তর্ধান।

সুখেন্দু ভাবতে লাগল—তবে কি ব্র[illegible] মত এ ও আজ স্বপ্ন !

কিন্তু তা নয়। সুচরিতার দেওয়া সেই লণ্ডন একজিবিশনের কাগজটা তার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। সেটা সুখেন্দু অন্যমনস্কর মত হাতে তুলে নিল।

সুখেন্দুর হঠাৎ মনে পড়ল—সুচরিতা বলেছিল, কোথায়ও তার থাকবার এখন জায়গা নেই। তাহলে মেয়েটা হঠাৎ চলে গেল কোথায়? একটু দাঁড়ালে কি পারত না? ব্রততীর মৃতদেহ ত প্রায় দগ্ধ শেষ।* সুখেন্দু একটু বিরক্ত হয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলল—যদি সুচরিতার দেখা একবার পায়? সত্যি, মেয়েটা যা বলে গেল তাই যদি তার আসল স্বরূপ হয় তাহলে ত যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু!

সুখেন্দুর কেমন যেন চেতনা সঞ্চার হতে লাগল। হঠাৎ সুচরিতা কোথা থেকে এসে উদয় হল। কিসব আবোল তাবোল বলে গেল যেন কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু অধিকার—ভুল বোঝা, এ সবের অর্থ কি? সুখেন্দু তার কে" যে সে তার কাছে থেকে জবাব চাইতে এসেছিল? সুখেন্দু ভাবতে লাগল—তবে কি? কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব? কিন্তু তবু যেন ..... সুচরিতা যা বলে গেল তার অর্থ ঐ ·· ·।

হঠাৎ সুখেন্দু প্রাণের মধ্যে কি এক যাতনা অনুভব করতে অন্ধকারে সুচরিতার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটতে লাগল—সুচরিতা আমি বুঝতে পেরেছি। আমি তোমায় ভুল বুঝিনি। সু-চ-রি-তা-। শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল সেই আকুল ডাক।